শুধু একটা রাত



অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

শুধু একটা রাত

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

SUDHU EAKTA RAT
by Abhijnan Roychowdhury

ISBN 978-93-89983-30-2
Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

আমার দুই অত্যন্ত প্রিয় ভাগ্নে
সাগ্নিক ঘোষ
ও
সাবর্ণ ঘোষ-কে

ভূমিকা

বহুদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল শারদীয়ার বাইরে একটা উপন্যাস লিখব, যেটা সরাসরি বই হিসেবে প্রকাশিত হবে। আমার সব উপন্যাসই নামী পত্রপত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়, যার অর্থ বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার আগেই সে উপন্যাস পড়ে ফেলে প্রায় লক্ষাধিক পাঠক।

সেজন্যে অনেকের ক্ষেত্রেই বইতে সেই উপন্যাস পড়ার প্রথম পাঠের শিহরণ থাকে না। কিন্তু নামী শারদীয়া পত্রপত্রিকার অনুরোধে লেখারই সময় হয়ে ওঠে না, সেখানে তার বাইরে আবার একটা লেখা! অবশেষে সে সুযোগ পেলাম।

সে ইচ্ছে থেকেই এ উপন্যাসিকা 'শুধু একটা রাত' লেখা শুরু, যা এর আগে কোনও শারদীয়া বা কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। একেবারে সরাসরি বইয়ের দুই মলাটে। এই গল্পের মধ্যে অবশ্য একটা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা মিশে আছে।

মনে আছে ইংল্যান্ডের একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে দেখেছিলাম জঙ্গলপরিবৃত এক প্রত্যন্ত জায়গায় এক পুরনো দিনের বিশাল বাড়ি। কৌতূহল হয়েছিল কে থাকতে পারে এরকম এক বিচ্ছিন্ন জায়গায়? আমি লেখক হিসেবে এতো পাঠককে দিনরাত ভয় দেখিয়ে চলেছি, কিন্তু আমি নিজেও কি থাকতে পারতাম এরকম এক বাড়িতে, শুধু একটা রাত?

তখনই ঠিক করি আমার সঙ্গে পাঠকদেরও নিয়ে যাব, এরকম কোনও ভূতুড়ে বাড়িতে। তাদের সঙ্গে রেখায়-লেখায় কাটাবো একটা বিশেষ রাত, খুব ভয়ের রাত। এমন এক রাত যেখানে পাঠক ভয়ও পাবে, আবার বই শেষ না করেও উঠতে পারবে না। এ গল্পের বীজ বোনা তখন থেকেই শুরু।

একই সঙ্গে এ বইতে আছে আছে আমার দুই জনপ্রিয় চরিত্র। অনিলিখা ও মিস্টার পাই, যাদের প্রত্যেকটা গল্প পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকো তোমরা।

অনিলিখার লেখা শুরু ১৯৯৬ সাল থেকে। আজ বাংলা সাহিত্যে হয়তো এমন কোনও কিশোরপাঠক নেই যে অনিলিখার গল্পপাঠের অপেক্ষায় থাকে না। সেই অনিলিখার দুটো বড় গল্প আছে এখানে। সঙ্গে অন্য একটা গল্পে আছেন মিস্টার পাই।

ধন্যবাদ জানাই দীপ প্রকাশনকে এ বই করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে। ধন্যবাদ জানাই তোমাদের মতো পাঠকদের যাদের আগ্রহ উদ্দীপনা ছাড়া আমি এ বইটা লিখে উঠতে পারতাম না। পাঠ শুভ হোক। পাশে কে বসে আছে সেটা শুধু খেয়াল করো না। সেক্ষেত্রে ফল শুভ না হতেও পারে!

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
২৮ অক্টোবর, ২০২০
কেনিলওয়ারথ, ইংল্যান্ড

সূচিপত্র

ডারউইনের ডায়েরি থেকে



বিশ্বজিৎদা সেদিন হঠাৎ ঝড় তুলল। ফুটবল—ক্রিকেট নয়, রাজনীতি নয়, খাওয়ার কথাও নয়। একেবারে চার্লস ডারউইন। কথা হচ্ছিল সাগ্নিকের জাহাজে করে আন্দামানে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে। সেখান থেকে একেবারে চার্লস ডারউইনের বিগলে করে সমুদ্রযাত্রায়। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন। এটাই বিশ্বজিৎদার স্বভাব। কিছু একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেই হল! কোনও—না—কোনওভাবে বিষয়টাকে তুলবেই।

বিশ্বজিৎদা বলতে শুরু করে,—ডারউইনের কেরিয়ারটা আমারই মতন। ছাত্রজীবন একেবারে সাদামাটা। বাবা—ই জোর করে কেমব্রিজে জিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন। কেমব্রিজ থেকে বাড়ি ফেরার পর উনি একটা চিঠি পান। ক্যাপ্টেন ফিৎজরয়ের কাছ থেকে। উনি বিশ্বভ্রমণে বেরোচ্ছেন। একজন প্রকৃতিবিদকে জায়গা দিতে পারেন। তবে সে—বাবদ উনি কোনওরকম টাকা দেবেন না। ডারউইনের হার্টের প্রবলেম ছিল। বাবারও আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও ডারউইন ওই দীর্ঘসফরে বেরিয়ে যান...বল তো যাত্রা শুরুর সালটা কত ছিল?

আমাদের নিরুত্তর দেখে বিশ্বজিৎদা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠে,—তোরা পড়ার বইয়ের বাইরে কোনও কিছুই তো জানলি না। শুনে রাখ, সালটা ছিল ১৮৩১।

আর দিনটা ছিল ২৭শে ডিসেম্বর।—খোলা দরজার সামনের চাতালে জুতো খুলতে—খুলতে অনিলিখা বলে ওঠে। অনিলিখাকে দেখেই বিশ্বজিৎদার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। উবে যাওয়ারই কথা। অনিলিখার সামনে আর জ্ঞান জাহির করা চলে না। এমন কোনও বিষয় নেই যা অনিলিখার অজানা। অতীতেও আমরা এর অনেক প্রমাণ পেয়েছি। অনিলিখার কথাই আমাদের কাছে বেদবাক্য। এমনকি বিশ্বজিৎদাও অনিলিখাকে আজকাল বেশ খাতির করে চলে।

তা অনিলিখা ফের বলে ওঠে,—ইংল্যান্ডের ড্যাভেনপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়। দু—দুবার যাত্রা শুরু করেও বাজে আবহাওয়া, ঝড় ইত্যাদির জন্য ফিরে আসতে হয়। কে তখন জানত, পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে উল্লেখ্য—যাত্রা হতে চলেছে! এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চিলি, পেরু ও প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কয়েকটা দ্বীপের তটভূমি সার্ভে করা। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিগল নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ—গোলার্ধে প্রবেশ করে। ১৮৩২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ওরা ব্রাজিলের বাহিয়া পৌঁছয়। ৩রা এপ্রিল, ১৮৩২ রিও—ডি—জেনেরোতে। ২০শে অক্টোবর, ১৮৩৫ সালে বিগল গ্যালাপাগোস দ্বীপ থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করে। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, কেপ অফ গুডহোপ, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসিকন দ্বীপ ছুঁয়ে ফলমাউথ পৌঁছয় ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর।

ডারউইন ফলমাউথে সেই ছোট জাহাজ ত্যাগ করেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ প্রায় পাঁচ বছর ডারউইনের কেটেছিল ওই জাহাজে। ডারউইনের ছিল ডায়েরি লেখার নেশা। রীতিমতো সাহিত্যিকের চোখে সবকিছু দেখতেন। ওঁরা কবে কোথায় গিয়েছিলেন, কী করেছিলেন তার যাবতীয় বিবরণী পাওয়া যায় ডারউইনের ডায়েরিতে।

ডারউইনের এই ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ হয়েছে। অনেকে পড়েছে। আমিও পড়েছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখে বেশ অদ্ভুত লেগেছে। যিনি প্রায় প্রতিদিন ডায়েরি লিখে গেছেন, তিনি হঠাৎ করে মাঝের পনেরো দিন লেখা ছেড়ে দিলেন কেন? আবার লেখা শুরু করলেন এমনভাবে যে তাতে কোনও বৈজ্ঞানিক বা অন্য তথ্যের ব্যাপার নেই, খালি দার্শনিকতা। ডায়েরির শেষের দিকের ডারউইন যেন আগের থেকে একেবারে আলাদা। এমন কী ঘটেছিল ওই পনেরো দিনে?

প্রশ্নটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই অনিলিখা উঠে দাঁড়িয়েছে। যেতে—যেতে বলে ওঠে,—পরের শনিবার পুরো ব্যাপারটা বলা যাবে। আজ বিশাল কাজের লিস্ট নিয়ে বেরিয়েছি। পাঁচমিনিট ঢুঁ মেরে গেলাম।

অনিলিখার কাছ থেকে জোর করে গল্প আদায় করা শিবেরও অসাধ্য। অন্তত এক সপ্তাহের অপেক্ষা।

পরের শনিবার ঠিক দুটোর সময় অনিলিখা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। আমরা সবাই অনেক আগেই জড়ো হয়েছি। অনিলিখার হাতে বেশ কয়েকটা কাগজ। চেয়ারটা টেনে নিয়ে ও সোজাসুজি বলতে শুরু করে,—

মাঝের পনেরো দিন লেখা হয়নি কথাটা ঠিক নয়। লেখা হয়েছিল। যাতে সবাই এই পনেরো দিনের কথা জানতে না—পারে, তাই ডারউইন অংশটা বাদ দিয়েছিলেন। আমি কী করে ওই পনেরো দিনের ডায়েরির খোঁজ পেলাম সে—সবের মধ্যে যাচ্ছি না। অরিজিনাল লেখাটা পড়ার ঠিক এক ঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম। পরে সেটা অনুবাদ করে সংক্ষেপে লিখে রাখি। আজ সেটাই পড়ে শোনাচ্ছি।

অক্টোবর ১, সকাল দশটা

খানিক আগে আমরা টিয়েরা—ডেল—ফুয়েগো ছেড়েছি। টিয়েরা—ডেল—ফুয়েগো দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্ত। ৫৩° দক্ষিণ অক্ষাংশে কিরকম ঠান্ডা হয় তা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না। জাহাজের মধ্যে একজায়গায় আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিলাম। জাহাজটা খুবই ছোট। জায়গার বড়ই অভাব। তবু তারমধ্যেই প্রায় তিনবছর কেটে গেল। এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। টিয়েরা—ডেল—ফুয়েগো ভারি অদ্ভুত জায়গা। তটভূমির প্রায় গা দিয়েই সারমিয়েন্টো পাহাড়। উচ্চতা বেশি নয়। সাতহাজার ফুট। কিন্তু পুরো বরফে ঢাকা। মাঝে—মাঝেই ভীষণ শব্দ করে বরফের চাঁই জলে এসে পড়ছে। অজস্র হিমবাহ জলে ইতস্তত ভাসছে। এর আঘাতে কত জাহাজের যে সলিলসমাধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাপ্টেন ফিৎজ তাই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আস্তে—আস্তে জাহাজ চালাচ্ছেন। হিমবাহগুলো ভয়ংকর হলে কী হবে! নীলচে হিমবাহর উপর সূর্যের আলো পড়ে যে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে, তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে চোখের খুব ক্ষতি হয়, অথচ চোখ সরাতেও ইচ্ছে হয় না। আপাতত আমরা উত্তরের দিকে চলেছি। ভাল পারেসোর দিকে।

যেতে—যেতে পুমার কথা মনে হচ্ছে। পুমা আসলে একধরনের সিংহ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকাতেই পুমা দেখা যায়। অবশ্য পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এদের আচার—ব্যবহার আলাদা। খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এদের চেহারাতেও। নিরক্ষরেখার উষ্ণ বনাঞ্চলেও যেমন এদের পাওয়া যায়, তেমনই আবার এদের দেখতে পাওয়া যায় টিয়েরা—ডেল—ফুয়েগোর মতো ঠান্ডা জায়গাতেও। সমতলেও যেমন দেখেছি, তেমনি এদের পায়ের ছাপ দেখেছি চিলির কর্ডিয়েলাতে দশহাজার ফুট উঁচুতে। ল্যা—প্লাভায় পুমার শিকার হয় হরিণ, অস্ট্রিচের মতো প্রাণীরা। মানুষের উপরে এরা কখনও আক্রমণ করে না। কিন্তু চিলিতে যেহেতু হরিণ অত সহজলভ্য নয়, তাই মানুষের উপর আক্রমণের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়।

এবার হামিংবার্ড—এর কথায় আসা যাক। লিজার মতো গরম জায়গাতেও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় টিয়েরা—ডেল—ফুয়েগোর বনে। তবে প্রয়োজন মতো এদের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে তাই ঠান্ডা জায়গায় যে হামিংবার্ড দেখেছি তারা অনেক বড়সড় পুরু পালকে মোড়া।

লেখায় বাধা আসছে। খানিকক্ষণ ধরে উপরে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। দেখে আসি কী ব্যাপার! আজকে লেখা এইটুকুই থাক!

অক্টোবর ২, রাত একটা

ভারি অদ্ভুত এই দ্বীপ, দ্বীপটা না দেখলে আমাদের পুরো যাত্রা বিফলই হতো মনে হয়। তা—কী করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছলাম? না, তাহলে একটু আগে থেকেই বলতে হয়।

সেদিন ডেকে চিৎকার—চেঁচামেচি হচ্ছে দেখে উপরে উঠে আসি। একটা অদ্ভুত প্রাণী জালে ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা ডলফিনের মতো। কিন্তু ডলফিনের মতো দাঁত নেই। রঙ উজ্জ্বল লাল। আর ডানার পাশ দিয়ে হাতের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আছে। ডাঙায় হাঁটার সময় সেটায় ভর করে হাঁটে। এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। সবথেকে অবাক ব্যাপার—আমরা যে ওকে ধরেছি, ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি, এরকম কোনও বোধই ওর মধ্যে নেই। দিব্যি আনন্দে আমাদের মধ্যে ঘুরে—ফিরে বেড়াতে লাগল।

খানিকবাদে হঠাৎ দেখি ক্যাপ্টেন আমাকে ডাকছে। দূরবিন হাতে খানিকটা দূরে জলের দিকে কী দেখাচ্ছে। দূরবিন চোখে দিলাম। আমাদের ধরা ওই প্রাণীটার মতোই একঝাঁক প্রাণী সাঁতরে যাচ্ছে উত্তর—পশ্চিম দিকে। আমরা ওই ঝাঁকটার পিছু নিলাম। দেখা যাক ওরা কোথায় যায়। আমাদের ধরা প্রাণীটাকেও খানিকবাদে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। ও গিয়ে ঝাঁকের মধ্যে মিশল।

মিনিট কুড়ি বাদে দেখলাম, আমরা একটা সবুজ তটভূমির দেখে এগোচ্ছি। ম্যাপে এই দ্বীপের কোনও চিহ্ন নেই।

আমরা দ্বীপের দিকেই এগোলাম। দ্বীপটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র থেকে সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। সমুদ্রের নীচে থেকে হঠাৎ করে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে শুনেছি এরকম ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। হয়তো বেশিদিন হল এই দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি। তাই এর অস্তিত্বের কথা সবার অজানা।

দ্বীপের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা ঘোরার পর খানিকটা সমতল তটভূমির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান দিয়ে হেঁটে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যাবে। জাহাজ নোঙর করে আমরা ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম এখানকার গাছগুলো ভিন্ন প্রজাতির। আর সব গাছেই কিরকম একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। খুব তীব্র পারফিউমের মতো। পথে কয়েকটা জলাশয় পড়ল। বিশ্রাম নেবার জন্য একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল, দ্বীপটার মধ্যে কিন্তু একটাও জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। প্রাণহীন দ্বীপ নাকি? ভাবতে—ভাবতেই হঠাৎ দেখি ঝোপের ভেতর থেকে একটা হরিণশ্রেণীর প্রাণী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিণশ্রেণী বলছি, কারণ হরিণের মতো রঙ নয়, গা

ঢ় নীল। আমি প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। উলটে ও যেন আমার মতোই একইরকম কৌতূহলে আমাকে মুখ তুলে দেখতে লাগল। ওর এই অদ্ভুত রঙের জন্য খুব সহজেই অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে উঠতে পারে।

সব জায়গাতেই কিছু লোক থাকে যারা বুদ্ধি—বিবেচনা দিয়ে কোনও কাজ করে না। ক্রিস পেচি ওরকমই একজন। হঠাৎ করে কোথা থেকে ক্রিস পেচি ছুটে এসে প্রাণীটাকে গাছের ডাল নিয়ে তাড়া করল। অবশ্য তাড়া করায় আমার ভালোই হল। দেখলাম এই প্রাণীটার হরিণের সঙ্গে আরেকটা তফাত আছে। তা হল এই প্রাণীটা হরিণের দশভাগের একভাগ বেগেও ছুটতে পারে না।

সেদিন আমরা ঠিক করলাম জাহাজে না—ফিরে তাঁবু খাটিয়ে দ্বীপেই রাত কাটাব। তেমন হিংস্র কোনও জানোয়ার এ—দ্বীপে আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য অনেক অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।

রাতে খাবার পর আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে বসলাম। কী অপূর্ব এই দ্বীপ! পাহাড়—হ্রদ—সমুদ্র সবুজে—ঢাকা উপত্যকা—কী নেই এ—দ্বীপে! কেউ যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য একজায়গায় এনে জড়ো করেছে। কিন্তু এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কোনও কিছু একটার যেন অভাব আছে। আর তাই বোধহয় সামনের পাইনের বনে ঝাঁপিয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখেও মন খারাপ লাগছিল।

তিনবছর হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি, বাবা—দাদা কে কেমন আছেন কিছুই খবর পাইনি। কী লাভ হয়েছে এই তিনবছর জাহাজে করে দেশ—বিদেশ ঘুরে! নানান ধরনের জীবজন্তু, গাছপালা আর জীবাশ্মের সন্ধানে জীবনের তিনটে মূল্যবান বছর হারিয়ে বসে আছি। জীবজগতের এই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না—কেন, এটুকু বুঝেছি আমার নেই।

আমার পাশে বসে আছে কেন ডারিংটন। মাঝারি চেহারা। জাহাজের কলকব্জা খুব ভালো বোঝে। মেনটেনান্সের জন্য ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারাক্ষণ হইচই করতে ভালোবাসে। তা সে—ও দেখছি মনমরা হয়ে বসে আছে। দু—একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। হুঁ—হাঁ বলে কাটিয়ে গেল। বুঝলাম ওর মনের অবস্থা ভালো নেই।

এরমধ্যে খানিকক্ষণ ধরে একটা খস—খস আওয়াজ শুরু হয়েছে। মাঝে—মাঝে পাচ্ছি, মাঝে—মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন—ই আবিষ্কার করল—শজারু। আমার ঠিক দুফুট দূরে নির্ভয়ে বসে আছে। ভয় অবশ্য আমারই পাওয়ার কথা! কাঁটা ফুটলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সতর্ক হবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। আবার অবশ্য নয়—কেন—এর। কেন কী একটা ফল খাচ্ছিল। তারই আকর্ষণে কিনা জানি না, হঠাৎ করে কেন—এর গা ঘেঁষে শজারুটা গিয়ে বসল। কেনও চমকে উঠেছিল। কিন্তু এবার আমার চমকে ওঠার পালা। কেন শজারুটাকে কোলে তুলে দিব্যি আদর করছে। খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে উঠল,—ডারউইন, হাত দিতে পার। এটা শজারু নয়। এর কাঁটাগুলে একেবারে নরম। হাত দিলে বেশ আরাম হয়।

একটু দ্বিধা নিয়ে কেন—এর কথামতো শজারুটার গায়ে হাত দিলাম। আশ্চর্য, কাঁটাগুলো শজারুর মতো শক্তও নয়, বিঁধেও যায় না। খুব নরম লম্বা—লম্বা রোমের উপর হাত দিলে যেমন লাগে সে—রকম। আর এ—প্রাণীটাও সত্যি অদ্ভুত। এরও কোনও ভয়ডর নেই। দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের মাঝখানে বসে রইল। যেন আমাদের পোষমানা, আমাদের সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে—সঙ্গে ঠান্ডাটাও বাড়ছে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে তাই মোমবাতির আলোয় ডায়েরি লিখতে বসেছি। খানিকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে—ভাবনাটা শুরু হয়েছে সেটা আর আজকে লিখলাম না। কালকে দেখা যাবে সেটা নেহাতই অমূলক কিনা!

অক্টোবর ৪, সন্ধে আটটা

দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। জানি না আমিও এই দ্বীপ ছেড়ে বেরতে পারব কিনা! নাকি আমার অবস্থাও কেন, রোজ, ডেভ, জনের মতো হতে চলেছে। আর তাই এই ডায়েরি—লেখাটা আরও বেশি প্রয়োজন। যাতে লোকে এরকম একটা ব্যতিক্রমী জায়গার অস্তিত্বের কথা জানতে পারে।

শুরু করা যাক কাল সকাল থেকে। পরশু রাতে কেন—এর নাক—ডাকা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। শজারু শ্রেণীর প্রাণীটাও আমাদের তাঁবুর মধ্যে এসে শুয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় চলে গেছে।

আরেকটু পরে আমরা দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরলাম। দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। গাছ থেকে যে—গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সেটা যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া ট্রপিকাল না—হলেও যে—জঙ্গলটায় ঢুকলাম তার সঙ্গে ট্রপিকাল ফরেস্টের অনেক মিল। আকাশ ছোঁয়া লম্বা—লম্বা গাছ সূর্যের মুখ দেখতে দেয় না। তবে এ—ধরনের বনে জীবজন্তু, পশুপাখি অজস্র থাকে। এখানে কিন্তু সে—রকম কিছু চোখে পড়ল না। একটা গাছের উপর খালি একটা শকুন বসে থাকতে দেখলাম। খানিকবাদে একটা সাপ চোখে পড়ল। নেতিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিং কোবরা। সাপের রাজাকে এ—রকম নিস্পৃহভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেও ফণা না—তুলে আস্তে—আস্তে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অসুস্থ হবে হয়তো।

ওদিকে ডেভ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—লাল ইঁদুর!

ওর অঙ্গুলিনির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। সাপটার থেকে হাতদুয়েক দূরে টকটকে লাল রঙের ইঁদুর। শিকার ও শিকারির এভাবে পাশাপাশি বসে থাকা কল্পনা করা যায় না। যেন দুজনেই আরও কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ইঁদুরের রঙ মেটে হলে চট করে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে লাল বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আমার মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা কিরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি আমার এতদিনের পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা সবই মিথ্যে? বিভিন্ন দেশের অজস্র জীবজন্তু উদ্ভিদশ্রেণী দেখে আমি সিদ্ধান্তে আসতে চলেছিলাম যে প্রত্যেক জীব তার জীবনধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তন ঠিক দিকে হলে সেই জীব এই জীবজগতে টিকে যায়। না—হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেক দেশের পুমার চেহারা তাই এক—একরকম। হামিংবার্ড এক—একরকম। কিন্তু এখানে যেন সবকিছুই

অন্যরকম। কারও কোনও আত্মরক্ষার অস্ত্রই নেই। তবু তারা কীভাবে যে জীবনসংগ্রামে টিকে আছে এটাই আশ্চর্য!

এসব ভাবতে—ভাবতে হাঁটতে থাকলাম। খানিকবাদে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা থেকে চারদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় উঠে গেছে। একটা কমখাড়া পাহাড়ের গা—বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা ওঠার পর জঙ্গল কিছুটা কমে গেল। আমরা ওই পাহাড়ের প্রায় উপরে উঠে গেছি। দ্বীপের বেশ খানিকটা জায়গা এখান থেকে দেখা যায়। সবুজ বনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লেকগুলো উপর থেকে দারুণ লাগছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এরই মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। একবার নয়, তিন—তিনবার। ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি জনের বন্দুক থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর ওর থেকে মোটামুটি কুড়ি হাত দূরে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। চিতাবাঘটা নাকি পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আস্তে—আস্তে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটাকে কাছ থেকে দেখলাম। অদ্ভুত। এর পায়ের পেশী দেখে মনে হয় না, গাছ বেয়ে উঠতে পারে। আমার এ—বিষয়ে অনেক পড়াশোনা আছে। দেখে মনে হল না এ খুব জোরে ছুটতে পারে। শরীরের গঠন সে—রকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

চিতাবাঘটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আমরা ঝোপ সরিয়ে—সরিয়ে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগোবার পরে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারদিকে বেশকিছু চতুষ্পদ প্রাণীর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটু দেখতেই বুঝলাম, এগুলো অন্য কোনও প্রাণীর নয়, চিতাবাঘের। তবে একটা নয়। বেশ কিছু চিতাবাঘের। কী ব্যাপার! এখানে কি কোনও দাবানল লেগেছিল! চারদিকের গাছ—মাটি দেখে তো অন্তত তা মনে হয় না। তাহলে কি আরও কোনও শক্তিশালী প্রাণীর শিকার হয়েছে এরা? কে জানে?

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সবার খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তাঁবুর উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করলাম।

দুপুরে খাওয়াটা বেশ জব্বর হল। টার্কির রোস্ট হয়েছিল। খাওয়ার পরে বিশ্রাম না—নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটু অন্যদিকে। সবাই খুব হতোদ্যম। বেরনোর আর উৎসাহ নেই, তাই একাই বেরোতে হল!

বনের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা হথহর্ন গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। গাছের সেই বিদঘুটে গন্ধটা মনকে কেমন অবসন্ন করে দিচ্ছে। বেঁচে থাকা বা না—থাকা, কাজ করা বা না—করা সবকিছুতেই কেমন যেন নির্লিপ্তি গড়ে উঠছে। জীবনকে সেই মুহূর্তে এতটাই অর্থহীন মনে হল। সে—গাছের তলাতে বসেই রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেতাম। একা এই ঘন—বনে রাত কাটানো। কিন্তু তখন সেই ভয়ও নেই। রওনা হলাম তাঁবুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু চাঁদের আলোতে এই বনবনানীর মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ খুঁজে পেলাম না। ঘণ্টাখানেক এদিক—ওদিক ঘোরার পর বুঝলাম পথ হারিয়েছি। সকাল হবার আগে ফেরার চেষ্টা করা বৃথা।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত না—কাটিয়ে একটু খোলা জায়গায় থাকা ভালো। তারই সন্ধানে এগোতে গিয়ে মনে হল দূরে আলো দেখা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ এগোবার পরে যে—দৃশ্যটা দেখতে পেলাম তা লিখে বোঝানো মুশকিল। খানিকদূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে। আর সেই লেকের ধারে প্রায় জনা—তিরিশ লোক জড়ো হয়েছে। লোক বলাটা উচিত হল কিনা জানি না। প্রায় একলক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যেরকম গুহামানব ছিল বলে ধারণা করা হয়, সে—রকম। বিশাল—বিশাল লোমশ চেহারা। ঘাড় বলে কোনও বস্তু নেই। হাঁটু অবধি লম্বা হাত।

ওদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা জাতীয় কিছু হচ্ছে বলে মনে হল। বেশ কয়েকটা একইধরনের ছোট—ছোট কাঠ পাশাপাশি মাটিতে রাখা আছে। এক—এক করে জনাদশেক লোক এসে যে—যার মতো কাঠ নির্বাচন করল। এবার উলটে কাঠের অন্যদিক দেখতে লাগল। মনে হল কাঠের অন্যদিকে কিছু একটা চিহ্ন আছে। একজনকে হঠাৎ খুব আনন্দিত ও উত্তেজিত মনে হল। বোধহয় সেই ঠিক কাঠ নির্বাচন করে

জিতেছে। একজন প্রধান—জাতীয় লোক এসে সেই লোকটার গলায় কাঠের টুকরো দিয়ে বোনা একটা মালা পরিয়ে দিল।

লেকের ধারে একজায়গায় বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে চিতার মতো করা ছিল। লোকটা গিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েকটা লোক লতাপাতা দিয়ে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কাঠের সঙ্গে বাঁধল। আরও কিছু কাঠ—চাপানো হল। কী হতে চলেছে বুঝতে পারছি না। এবার একটা মেয়ে এসে ওই কাঠের উপর কী একটা তরল ছড়িয়ে চকমকি ঘষে আগুন লাগানোর চেষ্টা শুরু করল।

কী হতে চলেছে? পুরস্কার হিসেবে জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে? এখানে কি তবে মৃত্যুটাই সবথেকে আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার?

এসব ভাবছি, ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়ে—পুরুষ সবাই মিলে সুর করে মন্ত্রজাতীয় কিছু একটা বলতে লাগল। তার মানে এরা একেবারে অনুন্নত নয়। এদের ভাষা আছে। হয়তো লিখতেও পারে। কারণ কাঠের উলটোদিকে কোনও একটা লেখা বা সংকেতজাতীয় কিছু একটা দেখেছিল নিশ্চয়ই।

মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে ওরা সবাই গোল হয়ে আগুন ঘিরে বসল। কারওর মুখে কোনও কথা নেই। হাসি নেই। এ—এক অদ্ভুত সভা। আমিও যে কতক্ষণ বসেছিলাম কে জানে!

সকাল হতে ওই লোকগুলো উলটোদিকের বনে ঢুকে গেল। আমাকেও আশা করি ওরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে—ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। মনে হল ওদের পিছু নিই। ওদের সম্বন্ধে আরও জানা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য, উৎসাহ পেলাম না। মনে হল এখানেই বসে থাকি। আরও ঘণ্টাখানেক পরে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। খিদে পেয়েছে, ফিরতেই হবে।

ফিরতে—ফিরতে আরও একঘণ্টা হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো তাঁবু, আমাকে আসতে দেখেই ক্যাপ্টেন ফিৎজরয় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে? আমি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোমার অবস্থাও কেন, ডেভের মতো হল কিনা!

একটু থেমে ফিৎজরয় ফের বলে উঠল,—না, না এ—দ্বীপে আর নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। সবাই কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—কেন, ডেভের কী হয়েছে?

—শুধু কেন, ডেভ! কালকে সন্ধে থেকে তোমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন নিখোঁজ। রাত আটটা নাগাদ তোমরা কেউ ফিরলে না—দেখে আমরা মশাল নিয়ে বেরোলাম। কালকে দুপুরে যেদিকে গিয়েছিলাম, সেদিকেই তোমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ওদিকে এগোলাম। কালকে আমরা যদ্দূর গিয়েছিলাম তার থেকে আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেলাম। এখানকার পাহাড়টা বেশ ন্যাড়া, গাছ বেশ কমে এসেছে, তাই দূর থেকে হঠাৎ কেন আর ডেভকে দেখতে পেলাম। ওরা দুজনেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে কেনকে ধরে ফেললেও, ডেভকে ধরতে পারিনি। তার আগেই নীচে ঝাঁপ দিয়েছে। ওর কোনও চিহ্নই নেই। খাড়া পাহাড়টার নীচের দিকে জঙ্গল। তারমধ্যে উপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কেন—এর তখনও ঘোর কাটেনি। বারবার বলে চলেছে, আমি মরতে চাই, আমি মরতে চাই। কালকের পর থেকে এখনও অবধি ওর ওই অবস্থা চলছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

—আর ডেভ?

—আমরা পাহাড়ের থেকে নেমে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। ডেভের মৃতদেহ পেলাম না, তবে যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। চারদিকে হাজার—হাজার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরাও প্রত্যেকে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। কতধরনের প্রাণীর কঙ্কাল যে ছড়িয়ে আছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। কিছু—কিছু কঙ্কাল তো আমার পরিচিত সব প্রাণীর থেকে অনেক বড় চেহারার প্রাণীর বলে মনে হল। মনে হল ওই জায়গাটা সবাই সুইসাইড—স্পট হিসেবে ব্যবহার করে। ওখান থেকে আমরা সোজা ফিরে

এলাম। রাত অনেক হয়ে গেছিল। সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন, মন খারাপ। বাকিদের খোঁজ এখনও পাইনি।... তা তোমার কী খবর?

আমিও আমার রাতের অভিজ্ঞতা ফিৎজরয়কে খুলে বললাম।

—আমার মনে হয় এ—দ্বীপের পরিবেশে এমন কিছু আছে, যার জন্য এই দ্বীপের জীবজন্তুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। হয়তো তারা বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। আরেকটা জিনিসও লক্ষ্য করার মতন। এ—দ্বীপের গাছ, পশুপাখি পৃথিবীর বাকি যে—কোনও জায়গার থেকে একদম অন্যরকম। আমার মনে হয় এ—দ্বীপে বেশ কিছুদিন থেকে এখানকার জীবজন্তুদের স্টাডি করা দরকার।

আমার কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল,—ডারউইন, তোমার মতো শুধু গবেষণা করতে আমি আসিনি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার সহযাত্রীদের সাবধানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর তাই আমার ইচ্ছে কালকেই এ—দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কাল সকালেই। সবাইকে আমি এই দ্বীপে হারাতে চাই না।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা বাকি পাঁচজনের খোঁজে বেরলাম। দ্বীপের বেশ কিছু জায়গা একেবারে দুর্গম। দিনের শেষে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন ওই পাঁচজনের খোঁজ তো পাওয়া যায়ইনি, উলটে আরেকজন খালাসিকেও শুনলাম সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে—ও নিখোঁজ।

সত্যিই এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর থাকা উচিত হবে না। অন্তত সব সহযাত্রীদের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

অক্টোবর ৬, সকাল দশটা

আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা ভাল পারেসোতে পৌঁছে যাব। অদ্ভুত ব্যাপার। দ্বীপ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সবার মধ্যে সেই নির্জীব ভাবটা কেটে গেছে। আমারও। মনে হচ্ছে জীবনটা কত মূল্যবান। তবে ওই দ্বীপের কথা এখনও মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। গত কয়েকদিনের কথা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে কিনা জানি না। দেশে ফিরে ওই দ্বীপের কথা বললে, জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই সে—কথার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

জীবজগতের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ—খাওয়ানোর জন্য যুগ—যুগ ধরে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে না পারলে সেই জীব হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়। খালি শক্তিমানেরাই টিকে যায়। কিন্তু এই দ্বীপ সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম। তার কারণ এ—দ্বীপের প্রত্যেকটা জীব—মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। অভিশপ্ত জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক এই কামনা করে। তাই কোনও জীবনসংগ্রাম নেই, কোনও প্রতিযোগিতা নেই, লড়ে বেঁচে থাকার তাগিদ নেই। এ—ধরনের পরিবেশে কি দরকার অভিযোজনের? কি দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর? এখানে তাই শক্তিমানেরা হারিয়ে যায়। তারা আত্মঘাতী হয়। পড়ে থাকে তারাই যারা দুর্বল, যারা নিরীহ। যেমন আমার হাতে ধরা এই শজারুটা, আমাদের সেই প্রথম দিনের বন্ধু।



গল্পের থেকেও এগিয়ে



—তারপরে কী হল?

—ওখানেই গল্প শেষ। ছোটগল্পের সবকিছু কি বলে দিতে হয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না—'শেষ হয়ে হইল না শেষ'! বাকিটা বুঝে নিতে হয়।

—তন্ময় বিজ্ঞের মতো বলে উঠল।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। তুই বলে না দিলে শেষ যে হল, তাও বুঝতাম না।

—পাশ থেকে প্রতীক বলে উঠল।

—আমিও সেই দলে। ভালো হচ্ছিল। কিন্তু শেষে যে কি হল কিছুই বোঝা গেল না।

—সহেলীও সায় দিল।

বিশ্বজিৎদাও সেই কোরাসে যোগ দিল—নাহ, তন্ময় এসব তোর দ্বারা হবে না। একমাত্র অনিলিখাই পারে। অনিলিখার গল্পগুলো যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, বেশ জম্পেশ হয়। চট করে ফাঁক-ফোকর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তোরটা যেন গল্প হিসেবেই দাঁড়ায়নি।

তন্ময় এবারে বেজায় খেপে অভিমানী গলায় বলে উঠল—নাহ, আর তোমাদের কষ্ট করে গল্প লিখে শোনাব না। এক সপ্তাহ ধরে লিখলাম। রাত জেগে। ভাবলাম তোমাদের ভালো লাগবে।

আজ অনিলিখাদি একদম ভারতীয় পোশাকে। একটা সবুজ সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। কানে সোনার দুল। খোলা চুল। দেখেই বোঝা যায় আজ সময় নিয়ে এসেছে। খুব মন দিয়ে শুনছিল।

অনিলিখাদি তন্ময়ের সমর্থনে এগিয়ে এলো।—না, না, ভালো চেষ্টা। লিখতে লিখতে আরও ইমপ্রুভ করবে। গল্প লেখা অত সহজ নয়। তা না হলে এত লোক লেখার চেষ্টা করে, কিন্তু এত কম ভালো লেখক কেন? এটা খুব শক্ত একটা কাজ। লেখা কথাও যতটা জরুরি, গল্পের না লেখা কথাগুলোও ঠিক ততটাই জরুরি। গল্পের শুরু লেখক করলেও গল্পের শেষ পাঠকই করে।

—ঠিক বলেছ অনিলিখাদি। সে জন্য স্টিফেন কিং বলেছেন ছোটগল্প হল এক অচেনা মানুষের কাছ থেকে অন্ধকারে চুম্বন পাওয়ার মতো।

—তন্ময় আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে ওঠে। যদিও এ মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না।

অনিলিখাদি ফের বলে ওঠে—গল্প লেখা খুব শক্ত কাজ। কম্পিউটার এতো কিছু করতে পারে। আমরা আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেসিন লার্নিং—এসব নিয়ে এতো কথা বলি, কিন্তু আমাদের রবিঠাকুর আজ থেকে একশো বছর আগেও যেরকম গল্প লিখে গেছেন, সেরকম মানের গল্প লিখতে কম্পিউটার আজ থেকে আরও একশোবছর পরেও পারবে কি?

—কম্পিউটার গল্প লিখবে মানে? এ আবার কি বিদঘুটে কথা! কোনদিন সম্ভব?

—বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

—একেবারে অসম্ভব বলব না। তবে সময় লাগবে। হয়তো সবার আগে ফ্যান্টাসি লিখতে শিখবে। কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করার ব্যাকরণ শিখতে আরও কয়েক যুগ লেগে যাবে। ভালো গল্প লিখতে শেখা আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর উন্নততম পর্যায়। সেটা আমরা চাইব না, কারণ এর অন্য অনেক অপপ্রয়োগ হবে।

—কেন? তাতে অসুবিধে কি?—বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

—কারণ যেদিন সেটা ওরা করতে শিখবে, সেদিন ওরা শুধু পাঠকের মন নিয়ে খেলা করবে না, সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও রাখবে। সেটা কি আমরা কোনওদিন চাইব? সেদিন—ফেক নিউজ তৈরি করবে, মানুষের অনুভূতি নিয়ে খেলতে শিখে যাবে, যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। যদি আগামীদিনে তোমার বাড়ির কাজের রোবটের আড়ালে থাকা প্রোগ্রাম রান্নার কাজ কমাতে বাজার থেকে এসে বলে যে বাজারে ইলিশ ওঠেনি, উচ্ছে-ভাজা খাওয়াই ভালো। সেটা কি তুমি চাইবে?

—অনিলিখাদি বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদা হাইহাই করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা বলার আগেই সহেলী বলে উঠল—কি ব্যাপার, কোনও একটা গল্প আছে এ ব্যাপারে মনে হচ্ছে অনিলিখাদি!

আমিও বলে উঠলাম—বলো না অনিলিখাদি, এটা তো তোমারই সাব্জেক্ট। এরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার?

আমরা সবাই একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এরকম সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

অনিলিখাদি শুধু বলে উঠল—ঠিক আছে বলছি। তবে ব্যাপারটা এখনও আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। তাই কিছু নাম-স্থান-কাল-পাত্র পাল্টে বলতে হবে।

—ওরেব্বাবা, এতো সাংঘাতিক ব্যাপার! মাছের কচুরির সঙ্গে যা জমবে না!

অনিলিখাদি বিদেশ থেকে বেশ কয়েকটা টিনে করে টুনা মাছ এনে দিয়েছিল। তাই দিয়ে আজ প্রতীকের বাড়িতে শনিবারের আসরে আমাদের টুনা মাছের কচুরি হচ্ছে। তার সঙ্গে বাইরে হঠাৎ বেশ জোরালো ঝড় শুরু হয়েছে। এর থেকে ভালো গল্পের পরিবেশ আর হয় না!

অনিলিখাদি বলতে শুরু করে—

প্রায় তিনমাস আগের কথা। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে ঘটনাটা ঘটেছিল। কোপেনহেগেন খুব নিরাপদ ছিমছাম শহর। জুন মাস। বেশ ভালো ওয়েদার। যেখানে ছিলাম সেটা কোপেনহেগেনের সিটি সেন্টারের কাছে। রাতে খাওয়ার পরে হাঁটতে বেরোলাম।

বেশ কিছুটা সময় ১৪১৬ থেকে ১৫২৩ সাল অব্দি কোপেনহেগেন ছিল নরডিকসের বড়ো একটা অঞ্চলের রাজধানী। এখনকার সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক জুড়ে বিশাল একটা জায়গা ছিল একটাই রাজপরিবারের অধীনে। আর তার রাজধানী ছিল কোপেনহেগেন।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় সে অতীতের প্রাচুর্যের পরিচয় এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে শহরের হাজার বছরের ইতিহাস সুন্দরভাবে সুরক্ষিত রয়েছে। সেজন্য পুরনো শহরের দিকে গিয়ে যেমন মধ্যযুগের পাথরের বাড়ি, পাথরের রাস্তা, ক্যাসল, চার্চ, প্যালেস এসব চোখে পড়ল, ঠিক তেমনই তার থেকে কিছু দূরে দেখলাম বিশাল বিশাল অত্যাধুনিক বিল্ডিং-এর আড়ালে আকাশ যেন ঢাকা পড়েছে।

ব্যাংকিং আর লাইফ সায়েন্স মেডিকাল রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু বড় বড় কোম্পানি আছে ডেনমার্কে। এখানেই আছে বিশ্বের প্রথম বিনোদন পার্ক 'ব্যাকেন' যা কিনা ১৫৮৩ সালে খোলা হয়েছিল।

দিনের বেলা বেশ গরম থাকলেও সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা কুড়ির কাছাকাছি নেমে এসেছে। তার মধ্যে বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। সব মিলিয়ে খুব উপভোগ্য। একটা আইসক্রিম কিনে পুরনো শহরের মধ্যে ছোট একটা বাগানে বসলাম।রাত দশটা নাগাদ সূর্যাস্ত হয়েছে। তারপরে আরও বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেছে। পুরনো শহরের ষড়ভুজ গ্যাস ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠেছে। তাদের নরম আলোর আঙুলের ছোঁয়ায় আশেপাশের স্থাপত্যের বার্ধক্যের বলিরেখা যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে মায়াবী পরিবেশ।

রাস্তায় লোক কমে এসেছে। কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়ে শুধু কিছু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। দূরে রাস্তায় একধারে গায়ে শাল জড়িয়ে একটা ভিখিরি বসে আছে। তার পাশে একটা পিয়ানো অ্যাকোরডিয়ন রাখা। সে বোধহয় খানিক আগেও ওটা বাজাচ্ছিল। এখন রাস্তার ধারে বসে ঝিমোচ্ছে। সামনে একটা বাটি রাখা, সেখানে যে যা পারছে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমার কি মনে হল জানি না। লোকাল কারেন্সী 'ক্রোন' ছিল না। ওই দোকান থেকে কারডে একটা আইসক্রিম কিনে লোকটাকে দিয়ে এলাম। লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাল।

দেখলাম লোকটা স্থানীয় হবে। নীলচে চোখ, সোনালি চুল, লম্বা চওড়া চেহারা। এখানকার গ্রামের দিকের লোকেদের মুখ-চোখ একটু ভোঁতামতো হয়। এ লোকটার মুখও সেরকমই।

আবার বাগানের বেঞ্চিতে এসে বসলাম। এখানে আলোটা কম। আইসক্রিম খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার থেকে কিছু দূরে আরেকটা বেঞ্চিতে একজন লোক বসে আছে। সেও যেন ওই লোকটাকে খুব কৌতূহল নিয়ে দেখছে। একবার চোখাচোখি হতেই চমকে উঠলাম। এতো 'কেন লিউ'। লোকটা অন্যদিকে মুখ ঘোরালেও ঠিক চিনতে পেরেছিলাম। নাহ, কোনও ভুল নেই। বিশেষ করে 'কেন'—এর মুখ একবার দেখলেই মনে রাখা যায়। বেশ অন্য ধরনের। মুখটা সরু লম্বা মতো। চওড়া ভুরু। নাকটা বেশ বড়। নাক আর পাতলা ঠোঁটের মধ্যের গ্যাপটা একটু যেন বেশি। একবার দেখলেই মুখটা ভোলা যায় না।

একটু থেমে অনিলিখা বলে উঠল—এখানে ব্যাপারটা বিচারাধীন বলে আমি নামটা বদলে নিলাম। আসল নামটা বলা উচিত নয়।

যা বলছিলাম। সামনে দেখি 'কেন লিউ'। ওঁকে সারা বিশ্ব চেনে বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসেবে। তবে ইদানীং উনি একটু বেশি ডার্ক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন। খুন—মৃত্যু—ভয়-এসব নিয়ে বেশি লিখছেন। কিছুদিন আগেও ওঁর এক ছোটগল্পের সংকলন পড়েছিলাম। তাতে এই পরিবর্তন আরও বেশি চোখে পড়েছে। সেই 'কেন' যে এখন এখানে থাকেন, কোপেনহেগেনে তা জানতাম না। অবশ্য উনিও আমার মতো বেড়াতে এসেছেন, এরকম হতে পারে।

'কেন'কে আমি অন্য পরিচয়েও চিনতাম। 'কেন' আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেসিন লারনিং-এর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও 'ইটিএইচ জুরিখ' ইউনিভারসিটিতে পড়াতেন।

আমিও ওই একই বিষয়ে গবেষণায় যুক্ত ছিলাম বলে আমার সঙ্গে একবার জুরিখের একটা কনফারেন্সে দেখা হয়েছিল। তখন লাঞ্চের সময় প্রায় আধ ঘণ্টা কথা হয়েছিল। তখনই ওঁর মুখে প্রথম শুনেছিলাম যে উনি মেসিনলার্নিংকে গল্প লেখার কাজে ব্যবহার করছেন। একই সঙ্গে সেটা যে তখনও একদমই ভালো কিছু লিখতে পারছে না, সেটাও বলেছিলেন।

—বলো কি? তখনই? কিভাবে এটা সম্ভব? লোকটা তো জিনিয়াস।—সৌগত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

—হ্যাঁ, 'কেন' সত্যি জিনিয়াস। তাছাড়া এরকমদুটো বিষয়েই দক্ষতা থাকায় এটা ওঁর পক্ষে করা আরও সহজ হয়েছিল। অনেক প্যারামিটার এর সাহায্য নিয়ে এক্ষেত্রে ডিপলার্নিংকে সুপারভাইজ বা পরিচালিত করা যায়। ভাষা শিখতে, উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে, চরিত্র গঠন করতে বা গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করতে, উনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করছিলেন। ডিপলার্নিং এর সাহায্য নিয়ে প্রোগ্রাম এমনভাবে করা যায় যাতে তা বিভিন্ন লেখকের নানা ধরনের লেখা পড়ে ক্রমশ শেখে।

ধরা যাক একটা প্রোগ্রাম 'ফেলুদা'র সব লেখা পড়ে ফেলল। তারপর তাকে বাংলা ব্যাকরণ শিখিয়ে দেওয়া হল। কিভাবে চরিত্র তৈরি করা যায়, সেটার জন্য গল্পের বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে একটা চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। তারপরে তাকে একটা নতুন ' ফেলুদা'র গল্প লিখতে বলা হল। এটাকে সুপারভাইজড বা পরিচালিত ডিপলার্নিং বলা যায়।

একই ভাবে গল্পের যে অন্য বিভিন্ন এলিমেন্ট থাকে, যা পাঠককে পাঠে নিবিষ্ট রাখে, সে সবের উপরেও কম্পিউটার প্রোগ্রামকে শেখানো যায়, যাতে প্রোগ্রাম আরও উন্নত হয়। 'কেন' নিজে খুব ভালো লেখক বলে এটা শেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।

—এসব করে কি লাভ?

—এক তো এর মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আরও বেশি উন্নত করা যায়, যার ব্যবহার অন্য অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে। তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল 'কেন' একটা বিশেষ কারণে এটা ব্যবহার করতে চান। ওঁর গল্পে নতুন ধরনের প্লট সৃষ্টি করার জন্য। এটাই যে কোনও লেখকের পক্ষে সব থেকে শক্ত কাজ।

—কিন্তু মানুষের থেকে কি প্রোগ্রাম ভালো কল্পনা করতে পারে?

—একটা শিশু যেভাবে কল্পনা করতে পারে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ সেভাবে কল্পনা করতে পারে না। তার কারণ আমরা যত বড় হই, তত বিভিন্ন নিয়ম কানুন, সংস্কার এসব শিখি। কিন্তু কম্পিউটারের কাছে

কোনও বাধানিষেধ না থাকায় তা যেকোনও কিছু কল্পনা করতে পারে। তাছাড়া এমন কিছু ভাবতে পারে যা হয়তো মানুষ কখনই ভাবতে পারে না। তবে সে কথা পরে বলছি।

কোপেনহেগেনে যখন দেখা হল, সেটা জুরিখের প্রায় দুই বছর পরে। দুমাস আগে 'কেন'-এর একটা ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ভালো লেখা। একেবারে আনকোরা সব নতুন প্লট। কিন্তু বড় ডার্ক। সব গল্প ঘিরে যেন অন্ধকার জগতের ছাপ।

তা সে যাই হোক, আমি লক্ষ্য করলাম উনি একা বসে আছেন। এরকম আলাপ করার সুযোগ কে ছাড়ে?

এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। আমাকে অবশ্য চিনতে পারলেন না।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম—অনেক দিন কোনও সায়েন্স ফিকশন পাচ্ছি না। যা পড়ছি প্রায় সব ডার্ক থিমের উপরে লেখা—খুন-রহস্য। কবে নতুন সায়েন্স ফিকশন পেতে পারি?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বলে উঠলেন—আসলে প্লট যখন যেমন আসে, তেমনই লিখি।

বলে উঠলাম—প্লট মানে আপনি কি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে ব্যবহার করে গল্প লিখছেন?

একটু যেন চমকে উঠলেন।

মনে হয় 'কেন' ভুলে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে বছর দুয়েক আগে দেখা হওয়ার কথা।

তারপরে সায় দিলেন, বলে উঠলেন—হ্যাঁ, আমি গল্প লেখার জন্য মাঝে মধ্যে প্রোগ্রামের দেওয়া প্লট ব্যবহার করি। তারপরে অবশ্যই আমার মতো করে পরিবর্তন করে নিই।

—এসব ব্যাপারে প্রোগ্রাম এখন কতটা উন্নত?

—এখনও শিক্ষানবীশ। আসলে আমাদের বিভিন্ন মানুষের চরিত্র, সম্পর্ক, কথা বলা,কাজকর্ম—এসব এত জটিল যে প্রোগামের পক্ষে মানুষকে পুরোপুরি বোঝার ক্ষমতা আজও নেই। কে কী বলতে পারে, কী করতে পারে সেটা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। সে জন্য প্রচুর আজগুবি প্লট তৈরি করতে পারলেও, সেটা মূলত ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এখনও আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

—কিন্তু এরকম নয়তো যে ওই প্রোগ্রামের তৈরি করা প্লট আপনাকে প্রভাবিত করছে? সে জন্যই কি এত ডার্ক লেখা পাচ্ছি?

একটু যেন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—কেন? কেন বলছ এ কথা? একটা সামান্য প্রোগ্রামের এত ক্ষমতা হবে যে তা আমার মতো লেখকের চিন্তাভাবনা পরিচালিত করতে পারবে? এটা খুব হাস্যকর চিন্তা। আমি আমার মতোই লিখি।

—আসলে মনে হচ্ছে আপনার লেখার মধ্যে ইদানীং যেন একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আগে আপনার লেখায় ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনার কথা ফুটে উঠত। সেটা এখন দেখছি না। তবে অনেক ভালো ভালো ডার্ক রহস্য, থ্রিলার লেখা পাচ্ছি।

—আসলে গল্পের প্রয়োজনে, পাঠকের যেরকম ভালো লাগবে সেরকমই তো লিখব, তাই না? আচ্ছা। এবার আসি।—বলে 'কেন' প্রায় হঠাৎ করে উঠে পড়লেন।

এতটাই অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন মুখে না প্রকাশ না করলেও আমার প্রশ্নে খানিকটা রেগে গিয়েছিলেন।

আমিও আর বেশিক্ষণ বসেছিলাম না। হোটেলে ফিরে এলাম।

এর দু-দিন বাদে আমাকে ওখান থেকে স্টকহোম যেতে হয়েছিল। পথে কোপেনহেগেন এয়ারপোর্ট—এরেন ডিয়ারের মাংস খেতে খেতে 'কোপেনহেগেন পোস্টে' খবরটা চোখে পড়ল।

ছোট খবর। একটা বছর কুড়ির মেয়ে গতকাল রাতে খুন হয়েছে। সেটা বড় কথা নয়। খুন হয়েছে একটা গৃহহীন মানুষের হাতে। তাকে পুলিস ধরেছে। সে ছবিটা দেখে বুঝলাম যাকে ধরা হয়েছে সেই লোকটা আর কেউ নয়, সেদিনের সেই ভিখারি, যাকে আইসক্রিম খাইয়েছিলাম। লোকটা অপরাধ স্বীকারও করে নিয়েছে। জায়গাটা ঠিক যেখানে আমি সেদিন বসে ছিলাম।

হঠাৎ করে আমার মনে কি যে হল পুলিসে যোগাযোগ করলাম।

—কেন?

—'কেন'-এর গল্প সংকলনের সব ক'টা গল্প আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। সে কথা আগেই বলেছি। তার মধ্যে একটা গল্পে অনেক কিছুর মধ্যে একটা ঘটনা ছিল যেখানে এক গৃহহীন ভিখারী রাতে ঠিক রাত বারোটার পরে যে ওখান দিয়ে যেত তাকেই খুন করত। বিনা কারণে। তার পিছনে একটা অত্যন্ত জটিল রহস্য ছিল। সেটা এখানে বলছি না। এক্ষেত্রে ওই মেয়েটা ঠিক রাত বারোটা দশে খুন হয়েছিল।

—তার মানে? এত কোয়েনসিডেন্স। তাতে 'কেন'-এর দোষ কি?

—আমার মনে হয়েছিল 'কেন' এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'কেন' লোকটাকে টাকা দিয়ে ঘটনাটা ঘটিয়েছিল। হয়তো ওঁকে ওখানে দেখেছিলাম বলে আরও সেটা মনে হয়েছিল। আমার জন্যেই সেদিন রাতে কোনও একজন অচেনা পথিক বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু দু দিন বাদে সেটাই ঘটল।

এটা অবশ্য শুধু একটা ঘটনার উপরে নির্ভর করে আমি অনুমান করিনি। এরকম আরেকটা ঘটনা আগেই শুনেছিলাম। সে ঘটনাটা ঘটেছিল সুইজারল্যান্ডে লুসারন শহরে। ঘটনাটা বলি।

একটা বাচ্চা ছেলে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে তদন্ত করে পুলিস একটা বছর তিরিশের মেয়েকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছিল। সে মেয়েটি নার্সের কাজ করত। ছেলেটার বয়স ছিল বছর দশেক। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবার বিশাল হোটেলের ব্যবসা। ছেলেটা বাড়ির পাশে বাগানে খেলতে গিয়ে হারিয়ে যায়। লুসারন খুব নিরাপদ শহর। তাই এরকম ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছিল সেখানকার পুলিস। অনেক তদন্ত হয়।

শেষে বাড়ির কিছু ডিজিটাল ছবি দেখে পুলিস প্রথম সূত্র পায়। ছেলেটার অনেক ছবিতে দূরে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। ডিজিটালি বড় করে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হলেও অনেক ছবিতে ওই একই মেয়ে আছে, যাকে বাড়ির কেউ চেনে না। শুধু ছবিতে যেন ধরা পড়ে গেছে।

তখনই পুলিস প্রথম সন্দেহ করে যে মেয়েটা এ অপহরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। হয়তো এ জন্যই ছেলেটার পিছু নিচ্ছিল। কিন্তু সেই মেয়েটাও রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন বাদে একটা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল পাওয়া যায়। লুসারনের থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরের একটা নদীর ধারে।

মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনে করা হচ্ছিল যে মেয়েটা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

পুলিস যে অপরাধীকে বার করতে পেরেছিল তার পিছনে অনেকটাই 'কেন'-এর কৃতিত্ব ছিল। ওর এরকম একটা গল্প ছিল। যেখানে একটা মেয়ে এভাবে টাকার লোভে এক খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে বাচ্চা কিডন্যাপ করবে। পরে ছবি থেকে সেই মেয়েটাকে সনাক্ত করা হবে। মেয়েটা স্বীকারও করবে। আমি সে গল্প পড়েছি। আমি প্রথমে সন্দেহ না করলেও ওই কথাটাও আমার মাথায় এসেছিল। মনে হয়েছিল 'কেন' ইচ্ছে করে মেয়েটার আড়ালে থেকে এরকম কিছু করেনি তো? ওই মেয়েটাকে এখনও খুজে পাওয়া যায়নি। তাকেও হয়ত মেরে ফেলা হয়েছে। 'কেন'-ই মেরেছে।

—কিন্তু কেন?

—এখানেই আসল প্রশ্ন। একটা কারণ খুব সহজে মনে হয় যে এরকম ঘটনা আগে লিখে ফেলার জন্য সে বই-এর প্রতি পাঠকদের আগ্রহ অনেক বেড়ে যাবে।

—ও মাই গড, তাই তো? গল্প সত্যি হয়ে গেলে আমরা সবাই পড়তে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠি।

অনিলিখাদি ফের বলে উঠল—তার বাইরেও একটা কারণ ছিল। 'কেন'-এর মনে হয়তো হয়েছিল যে উনি কম্পিউটার প্রোগ্রামের কাছে হেরে যাচ্ছেন। কেন স্বীকার না করলেও ওই প্রোগ্রামটা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। একটা প্রোগ্রাম ওঁর থেকে অনেক ভালো ভালো গল্পের প্লট তৈরি করতে পারছে, আর ওঁকে

প্রভাবিত করছে, সেটা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। শুধু যে ওঁকে প্রভাবিত করছিল তাই নয়, উনি ওঁর নিজস্ব প্লট—আইডিয়া হারিয়ে ফেলছিলেন।

তাই হয়তো চাইছিলেন তার উপরে আরেকটু পরিবর্তন এনে আরেকটা গল্প তৈরি করা, যেটা ঘটবে বাস্তবে। যাকে বলে খোদার উপরে খোদকারি। যেন এটা প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে উনি প্রোগ্রামের থেকে আরও এগিয়ে আছেন। খানিকটা প্লট চুরির অপরাধবোধ কাটিয়ে ওঠার জন্যও হতে পারে। সে জন্যই আমার কথায় ওভাবে রেগে গিয়েছিলেন।

—শেষে 'কেন'—এর কি হল?

অনিলিখা একটুক্ষণ চুপ করে একটু জল খেয়ে বলে উঠল—বললাম যে ব্যাপারটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। এখানে মনে করিয়ে দিই 'কেন' নামটা কিন্তু পুরোপুরি আমার কল্পিত। 'কেন' না হয়ে নামটা অন্য কিছুও হতে পারত।

—বলেই দাও না কে সে লোক? আমরা কি আর বলে বেড়াবো—সহেলী যেন একটু অভিমান করেই বলে উঠল।

—'কেন'-এর মতো দক্ষতা, ব্যাকগ্রাউন্ড কার আছে সেটা ভাবলেই আন্দাজ করতে পারবি।

তন্ময় মাতব্বরের মতো বলে উঠল কয়েকটা নাম।—আরনেস্ট ক্লিন, পিটার ওয়াটস, ডেনিস টেলর। কিন্তু ওঁরা তো মেসিল লার্নিং নিয়ে গবেষণা করছেন না!

—ব্যাস, তাহলে তো মিলল না।

পাশ থেকে সহেলী বলে উঠল—সে তো তুমিও হতে পার। 'কেন'—এর মতো তোমারও খুব ভালো কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখার ক্ষমতা আছে, আবার ওই মেসিন লার্নিং-এর মতো বিষয় নিয়ে তোমারও অনেক রিসার্চ আছে।

আমরা সবাই চমকে উঠে সহেলীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম

—মানে?

অনিলিখাদি কিছু বলল না। শুধু মুচকি হেসে উঠল। বলে উঠল

—হ্যাঁ, সেটাও অবশ্যই সম্ভব। তাছাড়া আমি ওই দুটো জায়গাতেই ছিলাম।

বিশ্বজিৎদা জল খাচ্ছিল। অনিলিখাদির কথায় বেজায় বিষম খেয়ে যা কাণ্ড করল সেটা নিয়ে আরেকটা গল্প অবশ্যই লেখা যেত।



মিস্টার পাই-এর শিকার



১৮ই সেপ্টেম্বর

—কমো এস্তাস প্রফেসরা পাই?

অর্থাৎ প্রফেসার পাই কেমন আছ?

ফোনের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে অসুবিধে হল না কে ফোন করেছে!

কার্লোস-এর ফোন।

মাদ্রিদে এসেছি এক সপ্তাহ। কার্লোস যে মাদ্রিদ থেকে মোটে একঘণ্টা দূরে থাকে সেটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

কার্লোসের সঙ্গে আমার এত বছরের আলাপ, যে কবে কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল, তাই ভুলে গেছি। ও জুওলজিস্ট বা প্রাণীবিদ। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও প্রাণীজগতের উপরে তার প্রভাবের উপরে ওর রিসার্চের জন্য বিজ্ঞানীমহলে ও সুবিদিত।

আমি এসেছি একটা বিখ্যাত সায়েন্স কনফারেন্সে। সেখানে অবশ্য কার্লোস আসে নি। কিন্তু আমি যে স্পেনে এসেছি সে খবরটা পেয়েছে।

ফোনে কার্লোস ফের বলে উঠল—কবে আসছ তাহলে আমার বাড়িতে?

আগে ফোন না করার অপরাধে মনে মনে লজ্জিত ছিলাম। সে অপরাধবোধ থেকেই হয়তো যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখানে আছি আরও দু দিন। সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব এরকম জানালাম।

কিন্তু কার্লোস সেটা শুনে হাই-হাই করে উঠল।—এক বেলা থাকলে হয় নাকি! কথাই হবে না! অন্তত একদিন রাতে থাকার প্ল্যান করে এসো। মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম সেই নেকড়েটার কথা, যাকে আমি চারনোবিল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম দু সপ্তাহ আগে! তোমার মতো গবেষেকও ওকে দেখে অনেক চিন্তাভাবনার ইন্ধন পেয়ে যাবে। তাছাড়া এতোদিন বাদে দেখা।

—নেকড়ে?—সেদিন যেন বেড়ালের কথা শুনেছিলাম। অবশ্য ভুল শুনে থাকতে পারি।

—হ্যাঁ, নেকড়ে বলেছিলাম না! কোথায় নেকড়ে আর কোথায় বেড়াল! তুমি বেশ কয়েকবার বললে খুব ইন্টারেস্টিং।

উত্তরে কিছু বললাম না। হ্যাঁ, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। এরকম একটা কথাবার্তা হয়েছিল বটে কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। আসলে তখন আমার মন অন্যদিকে ছিল।

আমি তখন আমার বাড়ির ল্যাবে কাজ করছিলাম। খুব দরকারি একটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ছিলাম। আমার আবিষ্কৃত আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর চুল কাটার যন্ত্র 'মেঘনাদ' দিয়ে গণেশের চুল কাটছিলাম। যন্ত্রটা তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সবে তৈরি করেছি। যার চুল কাটবে তার মুখের শেপ অনুযায়ী আর তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তার স্বভাব বুঝে সেরকম মানানসই চুল কাটবে।

আইডিয়াটা পাড়ার কানা হাবুল গুন্ডার ঘাসের লনের মতো ছোট করে কাটা চুল আর লম্বা ঝুলপি দেখে পেয়েছিলাম।

যন্ত্রটা মেশিন লারনিং-এর উপরে নির্ভর করে কাজ করে। সেটা দিয়েই আমার সহকারী গণেশের উপরে পরীক্ষা করছিলাম। ওর মাথা ভর্তি ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। একদম আইডিয়াল টেস্ট সাব্জেক্ট। নিজের উপরে তো আর পরীক্ষা করা যায় না। তার মধ্যে আমার ল্যাবের ফোনটা বেজে উঠেছিল। প্রথমে ধরিনি। দীর্ঘ রিং এর পরে থেমে গেল। তারপরে আবার যখন বাজতে শুরু করল, তখন বাধ্য হয়ে চুলকাটার যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ফোন ধরলাম।

দেখি কার্লোসের ফোন। তখনই প্রথম এই বেড়ালের বা নেকড়ের কথা শুনি। ও তখন রীতিমতো উত্তেজিত। এরকম বুদ্ধিমান প্রাণী নাকি আগে কখনো দেখেনি। চারনোবিলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেজন্য

চারনোবিল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রাণীটার উপরে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়।

স্বাভাবিকভাবেই আমি তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তাই অত মন দিয়ে কথা শুনিনি। ওই যে খানিকক্ষণ ফোনে কথা বলেছিলাম, তার জন্য সেদিন ফল খুব একটা ভালো হয়নি। গণেশের মাথায় ছোট ছোট বারোটা চুলের গোল আইল্যান্ড রেখে বাকিটা পুরো সাফ করে দিয়েছিল। আমার যে খুব খারাপ লেগেছিল তা নয়। তবে গণেশের আদৌ পছন্দ হয়নি।

—তা কবে আসছ?

উলটোদিক থেকে কার্লোস ফের বলে উঠল।—আমি আমার ড্রাইভার সহ গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমার আসতে কোনও অসুবিধে হবে না। কবে কখন আসতে পারবে শুধু জানিয়ে দিও।

সেরকমই কথা হল। গিয়ে এক রাত থেকে তার পরের দিন ফিরে আসব।

এখানে এতো কাছে এসে ওর বাড়ি যাব না, এটা হয় না। তার উপরে সেই বিশেষ নেকড়ে দেখারও ইচ্ছে আছে। ওরা এখানকার পুরনো পরিবার। শুনেছিলাম পুরোনোদিনের বিশাল ব্যারোক প্যালেসে থাকে। সেটাও দেখা যাবে।

আমার সঙ্গে এখানে আমার বন্ধু বিজ্ঞানী ডেভ বোল্টন আছেন। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছি।

২১ সেপ্টেম্বর

কাল সকাল আটটায় বেরোচ্ছি। কার্লোস-এর বাড়ি।

এখানে এ ক'দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। এরকম সায়েন্স কনফারেন্সে এলে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়। অনেক সময় একই আবিষ্কারের পিছনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা কাজ করে। কথা বললে অনেক নতুন আইডিয়া আসে।

আমি অবশ্য আমার বড় আবিষ্কারগুলোর কথা এসব কনফারেন্সে বলি না। আমার বেশ কিছু আবিষ্কার সময়ের থেকে এতটাই এগিয়ে আছে যে সেটা উপস্থিত অন্য বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করবে। তাদের মনোবল ভেঙে দেবে। ছোটখাটো আবিষ্কারগুলোর কথাই বেশি বলি।

যেমন এবারে বলেছি আমার আবিষ্কৃত গিল্ট আডমিশন যন্ত্রটা নিয়ে। এটা মাথায় পরালে অপরাধী দশ থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে তার সব অপরাধ স্বীকার করে নেবে। এটা ব্রেণের হিপ্পোক্যাম্পাসের কিছু অংশকে এমন ভাবে উদ্দীপ্ত করে যাতে অপরাধীর অপরাধবোধ ক্রমশ তীব্রতর হয়। শেষে অপরাধী যদি জ্ঞানত অপরাধ করে থাকে তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য।

বেশ কয়েকজন অপরাধীর উপরে কিভাবে এটা কাজ করেছে, সেই ভিডিও কনফারেন্সে দেখানো হয়েছিল। কিভাবে কাজ করে সেটা জেনে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ। কনফারেন্সের পরে একটা সুইস ম্যানুফাকচারিং সংস্থার অধিকর্তার সঙ্গে কথা হল। তারা এটা বড় স্কেলে তৈরি করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে তার থেকে যা লাভ হবে তার পঞ্চাশ শতাংশ কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর কাজে খরচ করতে হবে। এখনও লোকে বুঝতে পারছে না গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য কি হতে চলেছে। তার জন্য অবিলম্বে ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমাতে হবে। তবে তাতেও যে ২০৫০-এর আগে কিছু লাভ হবে না তা আমি জানি। একদিন নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে যে অন্য জায়গায় উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হবে সেটাও বোঝে না।

এত সহজে যে এরকম একটা যন্ত্র বার করা যায়, সেটাই অনেকের ধারণার বাইরে ছিল। ভারতীয় টাকায় এ যন্ত্র তৈরির খরচ পড়বে মোটে পাঁচশো কুড়ি টাকা।

আজ দুপুর একটা নাগাদ কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল। তারপরে ঘুরে ঘুরে মাদ্রিদ শহরটা দেখেছি। রয়াল প্যালেস অফ ম্যাড্রিদ দেখেছি। এখানে অবশ্য এখন স্পেনের রাজা থাকেন না। থাকলে সমস্যায় পড়তেন। যে প্যালেসে ৩৪১৮টা ঘর, সেখানে পথ হারানো খুব স্বাভাবিক।

তারপরে গ্র্যান্ড ভিয়া ধরে খানিকক্ষণ হাটলাম। বিশাল চওড়া রাস্তা। দু ধারে পাব, রেস্টুরেন্ট, বড় বড় দোকান। জমজমাট পরিবেশ। আমার মূল আগ্রহ ছিল অবশ্য প্রাদো মিউজিয়াম। ফ্রান্সিসকো গয়া-র অনেক বিখ্যাত পেন্টিং আছে ওখানে। 'লা মাহা ভেস্তিদা'-র মতো অনেক বিখ্যাত পেন্টিং আছে এখানে।

স্পেনের লোকেদের সঙ্গে ভারতীয়দের অনেক ব্যাপারে মিল আছে। খুব সহজে আলাপ করা যায়। ব্যবহারে একটা সহজ সরল ব্যাপার আছে, উষ্ণতা আছে।

আমার হাতে সাধারণত একটা ব্যাগ থাকে। আজ সেটা নিয়ে বেরোই নি। কি ভাবে জানি না অন্যমনস্ক হয়ে মেট্রো থেকে বেরোনোর পথে খেয়াল করলাম আজও আমার হাতে একটা ব্যাগ এসে গেছে। ভালো করে দেখলাম যে সেটা আমার কোনওভাবেই হতে পারে না। এর একটাই কারণ হতে পারে। ভুল করে অন্য কারুরটা নিয়ে চলে এসেছি।

কি আর করা যায়! ওখানেই অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। যদি কেউ এসে খোঁজ খবর নেয়। ঠিক হলও তাই। দেখি এক টাকমাথা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে কি সব বলে আমার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের চলে গেলেন। মনে হল ব্যবহারে সেই উষ্ণতা আছে।

হোটেল ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

কাল সকাল আটটায় আমাকে এখানে থেকে নিয়ে যেতে কার্লোসের গাড়ি আসবে।

একদিন থেকে পরশু দুপুরবেলা ফিরে আসব। পরশু রাতে আমার ভারতের ফ্লাইট। তবে আমি একা যাচ্ছি না। সঙ্গে ডেভ বোল্টনও যাচ্ছে। ডেভ কেম্ব্রিজের প্রফেসার। রোবটিক্সের রিসার্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছে। শুনেছি বর্তমানে আনম্যানড সম্পূর্ণ স্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ তৈরির কিছু কাজে ব্যস্ত আছে। ডেভ শুধু নামকরা বিজ্ঞানী নয়, শুনেছি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর সঙ্গে কাজ করে। ওর সঙ্গে অবশ্য কার্লোসের কোনও আলাপ নেই। তবে ও কার্লোস এর নাম শুনেছে।

কার্লোসের বাড়ি দেখতে ডেভ খুব আগ্রহী। কার্লোস খুব ধনী পরিবারের। শুনেছি রাজপরিবারের সঙ্গেও ওদের রক্তের সম্পর্ক আছে। বাড়িতে নাকি রাজপরিবারের অনেক ব্যক্তিগত জিনিস আছে।

এখন শুয়ে পড়ি। দূরে গির্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজল।

২২ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৩টে

টলেডোতে কার্লোস-এর বাড়ি পৌঁছতে দু ঘণ্টা লেগেছে। টলেডো খুব পুরনো শহর। একটা বড় অংশ জুড়ে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট। অবশ্য হবে নাই বা কেন! দীর্ঘ সময় ধরে এই শহরের পরিচিতি ছিল 'রাজার শহর' বলে। চার্লস ফাইভের প্যালেস ছিল এখানে। ১৫০০ থেকে ১৫৫৬ সাল অব্দি এখান থেকেই ইউরোপের একটা বড় অংশ জুড়ে রাজত্ব চালিয়েছেন চার্লস ফাইভ।

তারও অনেক আগে রোমান সাম্রাজ্যে এখানে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় হত এখানকার সার্কাসে। তখনকার দিনে সে সার্কাসে পনেরো হাজার লোকের বসার আয়োজন ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভিসিগথিক রাজত্বের সময় টলেডোর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তখন প্রায় দুই শতক ধরে টলেডো ছিল রাজধানী। ক্রিশ্চান, মুসলিম, ইহুদি তিন ধর্মের মানুষই এ শহরে বহু শতক ধরে একসঙ্গে বাস করে। তাই গাড়িতে করে যেতে যেতেই চার্চ, মসজিদ আর সিনাগগ তিনটেই সমানভাবে চোখে পড়ল।

কার্লোস-এর বাড়ি শহরের বাইরে। দুশো বছর ধরে ওদের পরিবার এখানে থাকে। পাঁচিল ঘেরা বিশাল বড় তিনতলা পাথরের বাড়ি। দেওয়াল জোড়া বিশাল বিশাল কাচের জানলা। কিছুদূর দিয়ে লিকলিকে কালো সাপের মতো বয়ে গেছে ট্যাগাস নদী। বাড়ির ভিতরে বিশাল দশ একর জমি। সেখানে শুনলাম বেশ কিছু ভেড়া, শুয়োর, গরু ঘোড়া এসব আছে। তাছাড়া বাড়িতে ভাইন ইয়ার্ড আছে। সেখান থেকে স্পেশাল রেড ওয়াইন তৈরি করা হয়।

আমরা আসায় কার্লোস অত্যন্ত খুশি। অনেকদিন পরে দেখলাম। ওর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথা জোড়া টাক। তবে দেখেই বোঝা যায় বেশ ফিট। রীতিমতো রেগুলার জিম করা চেহারা।

দুপুরে ট্যাপাস খাওয়ার পরে বাইরে বাগানে এসে বসলাম।

আমি কথায় কথায় বলে উঠলাম তুমি যে তোমার ওই নেকড়ে বাঘ দেখাবে বলেছিলে, সেটা কোথায়। খাঁচায়?

কার্লোস হাতে একটা ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে বসে ছিল। প্রশ্নটা শুনে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপরে আবার আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—কী-কিসের কথা?

—ওই যে তুমি বলেছিলে না যে চারনোবিল থেকে একটা নেকড়ে বাঘ এনেছিলে!

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খেয়াল ছিল না। ডিয়েগো।

কার্লোস তারপরেই ওর এক কর্মচারীকে ডেকে বলে উঠল—ডিয়েগোকে এখানে আসতে বল।

লোকটা দেখি ওকে বলে উঠল—স্যার, ও তো এখন খাচ্ছে। খাওয়া হলে আসবে।

লোকটার কথা শুনে একটু অবাক হলাম। বলার ধরন যেন বাড়ির পরিবারের কোনও সদস্যকে আসতে বলছে। সে যেন সব কথা বুঝতে পারে। আসতে বললে সে তার সময়মতো চলে আসবে।

কার্লোসকে জিজ্ঞেস করলাম—তা, চারনোবিলে গিয়েছিলে কেন? ওখানে তো সেই নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ হওয়ার পর থেকে আর কেউ থাকে না বলেই শুনেছি!

—হ্যাঁ, সেজন্যই তো গিয়েছিলাম। আসলে আমরা সচরাচর প্রকৃতির কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিই। উল্টোটা কমই হয়। কিন্তু সেটাই হয়েছে চারনোবিলে। ১৯৮৬ সালে সেই প্ল্যান্টের চার নম্বর রিয়াক্টরে বিস্ফোরণের কথা তো জানোই! তারপর থেকে ওই এলাকায় রেডিও অ্যাক্টিভিটির মাত্রা অস্বাভাবিক বেশি থাকার জন্য সবাই শুধু ওখান থেকেই নয়, আশেপাশের সব শহর ছেড়ে চলে যায়। বহু লোক মারা গিয়েছিল। এত বছরেও কোনও মানুষের বাস নেই ওখানে। পরিত্যক্ত শহর জুড়ে এখন ঘন জঙ্গল। শুধু জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং। তার গা বেয়ে লতা পাতা, গাছ আগাছার রাজপাট।

ডেভিড পাশ থেকে বলে উঠল—শুনেছি কুড়ি হাজার বছর পর্যন্ত কেউ ওখানে আর থাকতে পারবে না। তা তুমি গেলে কী করে? এখনো রেডিয়শন-এর মাত্রা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক!

—হ্যাঁ, সে অনেক সতর্কতা নিয়ে উপযুক্ত পোশাক পরেই গিয়েছিলাম একটা গ্রুপের সঙ্গে। আসলে আমাদের কাজ ছিল ওখানকার এই অস্বাভাবিক রেডিয়েশনে বন্য প্রাণীরা কীরকমভাবে আছে, তা দেখা। ওদের উপরে কোনও প্রভাব পড়ছে কিনা তা লক্ষ্য করা।

—ওখানে কি বন্য প্রাণী আছে?

—আছে মানে, তারা বেশ বহাল তবিয়তে আছে। ওখানে আর পাশের শহর প্রিপেয়াত, যেখানে ওই ফ্যাক্টরীর কর্মীরা থাকত—সেখানে লোকজন আর নেই। সে জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে বন-জঙ্গল আর বন্যপ্রাণী। আমি আর আমার সঙ্গে আরও তিন জনের দল ওই শহরের পরিত্যক্ত রাস্তাঘাট দিয়ে ঘোরার সময়ে মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোনও গ্রহে এসে গেছি। সে যে কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কি বলব! ঠিক মনে হচ্ছিল যেন এক মৃত শহর। তারপরে বুঝলাম মৃত শহর নয়। মানুষ নেই বটে। তবে আরও অনেকে আছে। হরিণ, শেয়াল, নেকড়ে আরও অনেক বন্যপ্রাণি। সেরকম কোনও প্রভাব পড়েনি ওদের উপরে। সেখানেই ডিয়েগোকে প্রথম দেখলাম। একাই ছিল। একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছিল।

—একা ছিল? নেকড়েরা সাধারণত দলে ঘোরে।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সাধারণত এরা মানুষ এড়িয়ে চলে। একটা দলে থাকে। সাধারণত মানুষ আক্রমণ করে না। তবে একটু দূরত্ব রেখে চলা ভালো। এদের সঙ্গে কিছু কুকুরের প্রজাতির অনেক মিল থাকলেও এরা অত সহজে পোষ মানে না। সেরকমই ধারণা ছিল যতক্ষণ না ডিয়েগোকে দেখি।

একটু থেমে ওয়াইনে ঠোঁট ঠেকিয়ে আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো কার্লোস। খানিকক্ষণ চুপ করে ফের বলে উঠল—তা যা বলছিলাম, আমরা একটা বিশেষ বিল্ডিং-এর খোঁজ করছিলাম। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন জানি না মনে হল ও যেন আমাদের আলোচনা বুঝতে পারছে। হঠাৎ দেখি আমাদের আগে আগে

যাচ্ছে। ওই পথ দেখিয়ে ওই বিল্ডিং অব্দি নিয়ে গেলো। তারপরেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদিন ছিল। যখন গাড়িতে উঠব, মনে হল যেন ও আমাদের সঙ্গে আসতে চায়। ওকে আমার এতো ভালোলেগে যায় আমি জিপে করে ওকে আমাদের হোটেলে নিয়ে আসি। তারপরে এখানে।

ফের খুব আস্তে আস্তে বলে উঠল—

এক দিক থেকে মনে হয় ও খুব সাধারণ নেকড়ে বাঘ। অন্যদিক থেকে মনে হয় ও যেন কোথায় একদম অন্যরকম।

বলে উঠলাম—নেকড়েরা এমনিতেই খুব বুদ্ধিমান হয়! এরা মূলত অসুস্থ প্রাণীদের শিকার করে। বলা হয় এভাবে নেকড়ে নাকি প্রাণীজগতে অসুস্থ প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে দেয় না। মানুষদের শুনেছি খুব কমই আক্রমণ করে। তোমার বক্তব্য অনুযায়ী যদি ও তোমার সব কথা বুঝতে পারে সেটা অবশ্যই অস্বাভাবিক ক্ষমতা। কিন্তু তার বাইরেও অন্য কোন ক্ষমতার কথা বলছ?

কার্লোস বলে উঠল— ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। এই এখনই এখানে আসবে। তোমরাই দেখে নিও।

কার্লোস-এর কথার মধ্যেই দেখি একটা নেকড়ে বাঘ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সত্যি বলতে কি দেখে একটু ভয়ই লাগছিল। খয়েরি রঙের। বেশ বড় সাইজের কুকুর যেরকম হয়। কিন্তু কানটা যেন ছোট ছুঁচলো। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ডেভিডও দেখি সতর্ক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

ও আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ঠোঁটে একটু মুচকি হাসি নিয়ে কার্লোস নেকড়ে বাঘটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—ডিয়েগো, তুমি তো মিস্টার পাই এর ছবি দেখেছ, কোনটা মিস্টার পাই বলতে পারবে?

বলতেই নেকড়েটা আমার দিকে তাকাল। কি আশ্চর্য যে সে দৃষ্টি। স্থির নির্মম চাহনি। একই সঙ্গে খুব গভীর দৃষ্টি। যেন আমাকে একটা মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেলে দেখছে।

কার্লোস আমার মনের ভাব বুঝে আবার বলে উঠল—ওকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এক ঘণ্টা এখানে থাকলেই বুঝতে পারবে যে ও একদম অন্যরকম। এমন কি ও আমাদের সব কথাও বুঝতে পারে।

শেষ কথাটা অবশ্য তখনও বিশ্বাস হয়নি।

২২ সেপ্টেম্বর, রাত দশটা

নাহ। দিনের শেষে বলতেই হবে ডিয়েগোর মতো বুদ্ধিমান প্রাণী আমি মানুষের বাইরে দেখিনি। হয়তো সেটাও বলা ঠিক হল না। অনেক মানুষের থেকে বুদ্ধি-বিবেচনায় এগিয়ে আছে। প্রত্যেকটা কথা বুঝতে পারে। উত্তর হাবেভাবে ঠিক বুঝিয়ে দেয়।

কার্লোসের ফার্মহাউসে অনেক ধরনের প্রাণী আছে। আমরা সন্ধে ছ'টা নাগাদ দেখতে গিয়েছিলাম। প্যাডকে চারটে ঘোড়া, প্রায় গোটা কুড়ি ভেড়া, গোটা দশেক শুয়োর, বেশ কিছু রাজহাঁস আছে।

কেন জানি না মনে হল ওদের সবার নেতা হল ডিয়েগো। ও যখনই তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সব ক'জন যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর অদৃশ্য আদেশ মানছে। সে ভাষা আমরা না বুঝতে পারলেও বাকি সবাই যেন বুঝতে পারছে। মাঝে-মধ্যে ডিয়েগো ডাকছিল। একটা অদ্ভুত সুরে। কেন জানি মনে হচ্ছিল ও যেন বাকিদের কিছু আদেশ দিচ্ছে। সবাই সেটা ফলো করছে।

ওর এই আশ্চর্য বুদ্ধির হাতে নাতে প্রমাণ পেলাম ডিনারের সময়। ডেভিড শোওয়ার ঘরে ফোন ফেলে এসেছিল। সেটা কথায় কথায় একবার শুধু বলেছিল। আমরা সবাই ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছিলাম। কিছু দূরে ডিয়েগো দাঁড়িয়ে ছিল।

খানিকক্ষণ ডিয়েগোকে দেখলাম না। খানিকবাদে দেখি মুখে করে একটা কাগজে জড়িয়ে ডেভিডের ফোন নিয়ে এসেছে যাতে দাঁতের চাপ ফোনে না লাগে। তার মানে শুধু আমাদের কথা বোঝা নয়, আমরা কে

কোন ঘরে আছি সেটা পর্যন্ত লক্ষ্য করেছে। এত কিছু একটা নেকড়ে বাঘের পক্ষে করা সম্ভব! এতোটাই ইন্টেলিজেন্ট!

ডেভিড ওর কাজের কথা বলছিল। রোবটিক্সের উপরে ও এখন কী কাজ করছে ইত্যাদি।

আমার দৃষ্টি ছিল ডিয়েগোর উপরে। দেখলাম ডিয়েগো মন দিয়ে শুনছে। কান খাড়া করে। যেন প্রত্যেকটা কথা বোঝার চেষ্টা করছে।

কথায় কথায় আমার বিভিন্ন আবিষ্কার নিয়েও আলোচনা চলছিল। ডিয়েগো যে শুনছে সেটার প্রমাণ পেলাম। কথায় কথায় আমার 'ডগ ল্যাঙ্গয়েজ ট্রান্সলেটর'-এর কথা উঠল যেটা কানে লাগিয়ে আমার বাড়ির বেড়াল ভূতো আশেপাশের বাড়ির বকাটে কুকুরগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারে, সেটা। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মুখের ভাব করে আমার দিকে তাকাল, তাতে স্পষ্ট ব্যঙ্গের ছোঁয়া। ভাবখানা এরকম, এ আবার কি এমন আবিষ্কার!

২৩ সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। কেন জানি না একটা অদ্ভুত ভয় মনের মধ্যে দানা বাঁধছে।

একটু আগে থেকে শুরু করি। একটা কথা কাল মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল। গতকাল শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল কার্লোস যেন খুব অন্যমনস্ক। যেন অনেক কথা শুনেও শুনছে না। কার্লোস এমনিতে বেশ চালাক চতুর মিশুকে লোক, একই সঙ্গে খুব সপ্রতিভ বা স্ট্রীটস্মার্ট বলা যায়। কিন্তু গতকাল অনেক দিন বাদে ওকে দেখে মনে হল ও যেন সবকিছু খুব শ্লথ গতিতে করছে, যেন এক কল্পনার জগতে মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

রাত সাড়ে দশটার সময় ডেভিড শুতে চলে গেল। তার খানিক বাদে ডিয়েগো দেখি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি আর কার্লোস গল্প করতে লাগলাম। কার্লোস নিজেই বলে উঠল—ক'দিন থেকে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো কিরকম যেন এলোমেলো, অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

—ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। কিছু ধরতে পারেনি। কিছুই অস্বাভাবিক খুঁজে পায়নি।

কাঁপাকাঁপা হাতে সামনে রাখা অরেঞ্জ জুসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ফের বলে উঠল—ডিয়েগোর বিশেষ ক্ষমতা কি বুঝতে পারলে?

আমি আশপাশ দেখে বলে উঠলাম—অবশ্যই খুব ইন্টেলিজেন্ট। তাছাড়া, কিছু একটা আছে ওর হাবেভাবে। মনে হয় যেন ওই বাড়ির মনিব।

বলেই মনে হল কি একটা অবান্তর কথা বলে উঠলাম। কার্লোস দেখি কিছুই বলল না। কি যেন চুপ করে ভাবছে মনে হল।

ও দাবা খেলতে বেশ ভালোবাসে জানি। কিন্তু দাবা খেলার অনুরোধ এড়িয়ে গেলো। আমার সঙ্গে গল্প করার সময় দেখি একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

যেখানে বসেছিলাম, সেখানে কিছু দূরে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। দেখি বইটাকে পাশের টেবিলে রেখে ওই আগুনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন ভাবছে!

খানিকবাদে ফের বলে উঠল—ডিয়েগোর গায়ের রংটা যেন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে। সবজেটে হয়ে যাচ্ছে।

—সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো?

—আমি খেয়াল করেছি। সেটা দেখে ওর উপরে বেশ কিছু টেস্ট করেছিলাম। শেষ রিপোর্টে কিছু অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি।

—কী?

—ব্লাড রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে ওর মধ্যে যেন কিছু ইনফেকশন হয়েছে। কী বুঝতে পারছি না।

—কোনও ছত্রাক—ফাঙ্গাস ইনফেকশন!

আমার প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে তাকাল কার্লোস। তারপরে বলে উঠল—হতে পারে।

যেখানে আমরা বসে আছি, সে ঘরে অন্য দেয়ালে সার দিকে বুক কেস। দেখি কার্লোস উঠে গিয়ে তার থেকে একটা বই নিয়ে এসে বসল। বইটা বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের উপরে। তারপরে তার থেকে একটা চ্যাপ্টার বার করে পড়তে শুরু করল। অফিও করডিসেপ্স ফাঙ্গাস-এর উপরে। এই ফাঙ্গাস-এর কথা আমি অবশ্য আগে থেকেই জানি।

বলে উঠলাম—হঠাৎ করে ওদের উপরে পড়াশোনা শুরু করলে?

—তুমি এদের কথা জানো?

—হ্যাঁ, কিছুটা জানি। এদের সঙ্গে পিঁপড়েদের পরজীবীসম্পর্ক খুব অদ্ভুত। এরা পিঁপড়েদের প্রভাবিত করে কাছে টেনে আনে। কিভাবে সেটা করে সেটা অবশ্য আমরা জানি না। তারপরে পিঁপড়ের মধ্যে এরা এদের বীজবপন করে। শেষে সেই পিঁপড়েদের মেরে ফেলে। এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরজীবী সম্পর্ক।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

আবার বইটা রেখে দিয়ে কার্লোস বলে উঠল। জানি না কেন কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারছি না।

একটু বাদে ফের বলে উঠল—আসলে প্রাণীজগৎ এত ইন্টারেস্টিং, আমরা আর কতটুকুই বা জানি! তুমি 'অ্যালকন ব্লু' প্রজাপতিদের কথা জানো তো?

—হ্যাঁ। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জীবনচক্র। হাঙ্গেরীতে ওদের দেখা যায়। পড়েছিলাম ওই প্রজাপতি এক বিশেষ ধরনের গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে শুঁয়োপোকা যখন হয়, তখন তারা পাতা থেকে নীচের ঘাসের উপরে গিয়ে পড়ে। সেই শুঁয়োপোকা নাকি পিঁপড়েদের রাণির মতো করে আওয়াজ করতে পারে। কিভাবে তারা এই আওয়াজ করতে শেখে, সেটাই আশ্চর্য। শ্রমিক পিঁপড়েরা তখন ওই শুঁয়োপোকাকে দেখে ওদের রানি ভেবে খাতির করে ওদের বাসায় নিয়ে যায়। তারপরে সে বাসায় নাকি বছর দুয়েক ভারী আদরযত্নে জামাইআদরে থাকে। শেষে প্রজাপতি হয়ে ওই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

—তুমি যে কোন বিষয়টা জানো না মিস্টার পাই, তা ভেবেই অবাক হই। আজকাল বিজ্ঞানীরা এত স্পেসালাইজড হয়ে গেছে যে তারা নিজেদের বিষয়ের বাইরে অন্য কোনও কিছুরই খবর রাখে না। এই আমার কথাই ধর। আমি আমার বিষয়ের বাইরে কোথায় কি হচ্ছে, কিছুই খবর রাখি না। এখানে একটা কথা আরও বলি ওই প্রজাপতি হবার ওপরে ওরা কিন্তু আর মাত্র কয়েকদিন বেঁচে থাকে। কি অদ্ভুত লাইফসাইকেল, তাই না?

আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম। ওর মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা। কখনও ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে বসছে। কখনও সোফায়। কখনও বা ঘরের ভিতরে হাঁটছে।

আমি বলে উঠলাম—তোমার ফ্যামিলির সবাই ভালোই আছে তো?

ও কোনও কথা বলল না খানিকক্ষণ। তারপরে বলে উঠল—না, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। সেই আইনি প্রসেসটা চলছে।

বুঝতে পারলাম এজন্যই হয়তো ও টেনশনে আছে।

আমি আমার ব্যাগ থেকে খুলে একটা বড়ি দিলাম। এটা আমার তৈরি ভেষজ বড়ি। যে কোনও ধরনের উত্তেজনা প্রশমিত করে। আমাদের মনের বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনার স্রোতের মধ্যে কোনটা ঠিক করা উচিত, সেটা বুঝতে সাহায্য করে। কোন কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমি বলার পরে আমাকে বিশ্বাস করে খেল। তার খানিকবাদে একটা ভারী অদ্ভুত কথা বলে উঠল—কেন জানি না খুব হরিণ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। বড় হরিণ।

এ কথার কোনও অর্থ হয় না। হয়তো কোনও মানসিক চাপে ভুগছে।

রাত অনেক হচ্ছিল। বারোটা নাগাদ আমি শুতে চলে গেলাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না।

আমার পাশে ডেভিডের ঘর। রাত একটা নাগাদ মনে হল ওর ঘরের থেকে সামান্য আওয়াজ আসছে। মনে হল যেন কিছু একটা ওর ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে কাঠের দেওয়াল। খেয়াল করতে বুঝলাম একটা চারপেয়ে কিছুর ঘুরে বেরানোর, নিশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ।

ডেভিডের ঘরে কি ডিয়েগো এসে ঢুকেছে? কিন্তু এত রাতে! এখানকার ঘরগুলো বন্ধ করার উপায় নেই। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মিনিট দুয়েক বাদে দেখি আমার ধারণা ঠিক। ডেভিডের ঘর থেকে ডিয়েগো বেরিয়ে এল। বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আমার দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ফের ওদিকে এগিয়ে গেল। ডেভিডের দরজা সামান্য খোলা ছিল। ঠেলে ওর ঘরে ঢুকলাম। ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম ডেভিড নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বিরক্ত না করে আবার আমার ঘরে ফিরে এলাম।

কিন্তু ঘুম আর এলো না। ফের খানিকক্ষণ শোওয়ার চেষ্টা করে উঠে পড়লাম। আমার ঘরে জানলা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে। জানলার কাছে এসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অপূর্ব দৃশ্য। জানলা দিয়ে কার্লোস-এর বিশাল বাগানটা দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। বাগান দূরে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরে ঘন জঙ্গল। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। যেন চাঁদের আলোর ক্যানভাসে আঁকা কোনও শিল্পীর ছবি।

হঠাৎ দেখলাম ডিয়েগো বাড়ির পিছনের গেট দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল। জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করল। সে যেতেই পারে। কিন্ত ওর পিছু পিছু কে যাচ্ছে? কার্লোস? এত রাতে? ওদিকে কেন যাচ্ছে?

ডিয়েগোর বাধ্য শিষ্যের মতো কার্লোস ওর পিছু পিছু যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। আমি ওদিকে তাকিয়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক বাদে দূর থেকে একটা নেকড়ে বাঘের ডাক বা হাউলিং শুনতে পেলাম। চারদিক নিস্তব্ধ বলেই হয়তো মোটা কাচের জানলার এপার থেকে শুনতে পেলাম। কীরকম যেন গায়ে শিহরণ জাগানো ডাক। উ উ উ। আবার দ্বিতীয়বার ডাকটা শুনলাম।

২৩ সেপ্টেম্বর, রাত দশটা

চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে আছি। এখন একটু ঠান্ডাও লাগছে। এটা যে কোথায় তা জানি না। তবে এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির অজস্র ঘরের মধ্যে কোনও একটা, সেটা জানি।

মাথায় এখনও অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ফেটে যায়নি তো! মাথায় হাত বোলালাম। নাহ, বেশ খানিকটা ফুলে গেছে বটে। কিন্তু ফেটে যায়নি। তাহলে চুল ভিজে থাকত। মনে হচ্ছে আমার ঝাকড়া চুলই আমাকে বাঁচিয়েছে। তা না হলে—

মনে করার চেষ্টা করলাম শুরু থেকে। উফ, কি ভয়ানক!

সকালে ন'টা নাগাদ নীচে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি সেখানে ডেভিড বসে আছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল —আচ্ছা, তুমি কার্লোসকে দেখেছ? সকাল থেকে কাউকে এখানে দেখছি না। বাড়ির কাজের লোকেরাও উধাও।

আমিও একটু অবাক হলাম। সত্যি, তাই। আমি নিজেও আগে নীচে চলে আসতাম কার্লোস-এর ডাক পেলে।

বাইরে সব চুপচাপ দেখে ভাবছিলাম, হয়তো কারুর ঘুম ভাঙেনি। ব্যাগ থেকে বার করে 'অদ্বিতীয় টেনিদা' পড়ছিলাম। এরকম কিছু বাংলা বই সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। পড়তে পড়তে সময়ের খেয়াল ছিল না।

এখানে সবাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে। আটটার মধ্যে। কোথায় গেল সবাই?

এই কথার মধ্যেই দেখি পায়ের শব্দ ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে আসছে। কার্লোস-এর এক কর্মচারী, গতকাল দেখেছি, নামটা জানা হয়নি, আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। ডাইনিং রুমে ডাকছে। কার্লোস কোথায়

জিজ্ঞেস করতে ভারী অদ্ভুত উত্তর পেলাম। কার্লোস বাড়ি নেই। কোথায় গেছে তারও কোনও খবর জানে না।

শুনেই জিজ্ঞেস করলাম—ডিয়েগো কোথায়?

লোকটার উত্তর দেওয়ার দরকার পড়ল না। দেখি আমাদের ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে ডিয়েগো দাঁড়িয়ে আছে। কিরকম যেন হিংস্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কুকুর আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে যে অনেক তফাত আছে, সেটা ওই চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমি ডেভিডকে বলে উঠলাম গতরাতের ঘটনা। রাতে দেখেছি ডিয়েগোর সঙ্গে কার্লোসকে বাগানে যেতে।

ওর এই কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম—এখানকার পুলিসে খবর দেওয়া দরকার। এখানে ওর কোনও আত্মীয় আছে?

—না, স্যার এখানে একাই থাকেন। কাছাকাছি কেউ থাকে না। তবে স্যারের বোন আছেন বার্সেলোনায়। ওকে ফোন করবেন? দাঁড়ান, নাম্বারটা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আরেকটু দেখে নিলে হত না?

—এই বাড়িতে এখন আর কে আছে?

—এই আপনারাই।

—মানে? গতকাল তো আরও বেশ কয়েকজন কাজের লোক ছিল। তারা কোথায়?

—তারা সব আজ ছুটিতে। আজ রোববার। ওদের রোববার ছুটি দেওয়া হয়।

আমি বেশ অবাক হলাম। আমরা দুজন এখানে আসছি, সেটা জেনেও কার্লোস সবাইকে ছুটি দিয়েছে? লোকটাকে সেটাই বলে উঠলাম।

লোকটা ফের বলে উঠল—জানি না, স্যার কি ভেবে দিয়েছিলেন। হয়তো আগে জানতেন না বলে।

আমার মনে কিছু অশুভ চিন্তা আসছিল। খেতে ইচ্ছে হল না।

বলে উঠলাম—চলো, আমরা আগে ভালো করে বাড়িটা দেখে আসি। আমার সঙ্গে আসো।

বলে দরজার দিকে এগোলাম।

দেখি ইতিমধ্যে ডিয়েগো ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। একটা দিকে সরে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে এসেছি, ঠিক তখনই কেউ যেন আমার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করল। ব্যাস। তারপরেই চোখে অন্ধকার।

খানিকআগে জ্ঞান ফিরেছে। ফোনটা জ্যাকেটের মধ্যে ছিল। নেটওয়ার্ক নেই এখানে। এখন সময় দেখাচ্ছে রাত ন'টা। মাঝে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম!

এবারে আমি ফোনের আলোয় ঘরটাকে দেখলাম। মনে হল একটা সময় এ ঘর আস্তাবলের কাজে ব্যবহার করা হত। কাঠের পারটিশন দিয়ে আলাদা করা চারটে ঘোড়া রাখার জায়গা। খড়-বিচুলিও ছড়ানো আছে। কিন্তু ঘোড়া নেই। শুধু নেই তাই নয়, মনে হয় না যে সেই কাজে এটা বহু বছর ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা এই ঘরের চেহারা দেখে বোঝা যায়। চারদিকে নোংরা, আবর্জনা ছড়ানো। মাটিতে পায়রা জাতীয় কোনও একটা পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে।

ঘরে কোনও জানলা নেই। উঁচু ছাদ। ঘরের একদিকে দুই পাশে বিশাল উঁচু কাঠের দরজা। দুটোই বাইরে থেকে বন্ধ। দরজার কাঠ যা মোটা তাতে এ দরজা ভাঙা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বেশ খানিকক্ষণ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না।

ঘরের অন্ধকার আমার চোখে সয়ে এলেও, কিরকম যেন দমবন্ধ লাগছে। ঘরের মধ্যে এমন কিছু নেই যা দিয়ে কোনও দরজা খোলার চেষ্টা করা যায়। ফোনের চার্জ কমে আসছে।

২৫ সেপ্টেম্বর

এখন টলেডো রয়্যাল হাসপাতালে আছি। শরীর খুব দুর্বল লাগছে। আসলে প্রায় দু'দিন ঘরে বন্দী ছিলাম। জলখাবার কিছুই পাইনি। তাছাড়া বন্ধ ঘরের বাতাসে অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছিলাম।

একটু আগে থেকে পুরো ঘটনাটা বলার চেষ্টা করি।

কি হচ্ছে ব্যাপারটার একটা ধারণা করতে পারছিলাম। কিন্তু এই ঘর থেকে বেরোনোর কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

একটাই ভরসা। কল্যানগড়ের ল্যাবে আমার তৈরি রোবট লিও জানে যে আমার দিক থেকে কখনো আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি কোনও নির্দেশ না এলে আমার বড় কিছু একটা বিপদ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ও প্রথম আমাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সেটা না করতে পারলে গণেশকে জানাবে। তারপরে ও আর গণেশ মিলে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

কিন্তু কলকাতায় থাকলে একরকম। আমি এখন স্পেনে। খোঁজাখুঁজি করলে আমি যে এখানে এসেছি সেটা অবশ্য ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। সেটা বোঝার অনেক উপায় আছে। আমার ফোন ট্রেস করা যেতে পারে। আরও অনেক কিছু। কিন্তু তার জন্য সময় লাগে।

কিন্তু তার আগেই যে যেকোনও মুহূর্তে বিপদ এগিয়ে আসতে পারে, তা জানতাম। যদি এ ঘরে ডিয়েগো আসে।

ঠিক সেটাই হল। আমি ক্লান্ত হলেও সজাগ ছিলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম বন্ধ দরজার সামনে একটা চতুষ্পদ জীব এসে দাঁড়িয়েছে। কার্লোসের যা হয়েছে, একই জিনিস হতে চলেছে আমার ভাগ্যে।

সাধারণত আমার কাছে আত্মরক্ষার্থে একটা পেন থাকে, যা থেকে হাইভোল্টেজ ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাটা এত আচমকা হয়েছে যে আমার কাছে কিছুই নেই এখন।

একটা জান্তব গন্ধ দরজার ওপার থেকে আসছে। কিন্তু ডিয়েগো কি একা? নাকি সঙ্গে সেই চাকরটাও আছে যে আমাকে পিছন থেকে মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল।

মনে হয় সেই লোকটাও আসছে। আর তার জন্যই অপেক্ষা করছে ডিয়েগো। নেকড়ে বাঘের যতোই বুদ্ধি থাকুক না কেন তার পক্ষে একা দরজার লক খোলা সম্ভব নয়। লোকটার পায়ের শব্দ দরজার সামনে এসে থামল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে গেল। বাইরের থেকে একরাশ আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আর তার পরক্ষণেই আমার দিকে এগিয়ে এল ডিয়েগো। ওর সরু হিংস্র হলুদ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একটা চাপা গর্জন করে উঠল। তখন দেখতে পেলাম ওর ধারালো দাঁতগুলো।

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুত হচ্ছি ওর ঝাঁপিয়ে পরার, এর মধ্যে হঠাৎ করে গুলির আওয়াজ হল। দু দুটো। দেখি ডিয়েগো ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছে।

তারপরে আরও বেশ কয়েকটা গুলি। একটা দেখলাম ওই চাকরটার পায়েও লেগেছে। লোকটা চিৎকার করে বসে পড়েছে।

ডেভিড দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডিয়েগো আহত। তবু ডেভিডের দিকে না গিয়ে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। ডেভিডের আরও একটা গুলিতে ওর নিথর দেহটা এবারে দূরে ছিটকে পড়ল।

২৫ সেপ্টেম্বর

টলেডোর পুলিসের ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টরকে বলছিলাম ঘটনাটা। ডেভিডও শুনছিল। সঙ্গে ছিল আইবেরিয়া পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আরও বেশ কয়েকজন।

এখানে বলে রাখি কার্লোসের ক্ষত বিক্ষত দেহটা ওর বাড়ির পিছনের দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গতকাল পাওয়া গিয়েছে।

ওর মৃত্যু যে নেকড়ের আক্রমণে তা নিয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কোনও দ্বিধা নেই। দাঁত আর নখের দাগ ডিয়েগোর সঙ্গে মিলে গেছে। প্রশ্ন কেন ডিয়েগো আক্রমণ করেছিল ওর মনিবকে। নেকড়ে কুকুরের মতো অত প্রভুভক্ত হয় না ঠিকই, কিন্তু এরকম মানুষকে আক্রমণের কথাও খুব বেশি শোনা যায় না।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন মনিব কে? ডিয়েগো না কার্লোস?

আমি বলে উঠলাম—বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে বাড়ির আসল কর্তা আর কেউ নয়, ডিয়েগো। এটাই ছিল ডিয়েগোর আসল বিশেষত্ব। সে শুধু কার্লোসকে নিয়ন্ত্রণ করত না, করত বাড়ির সবাইকে। এমনকি খামারবাড়ির অন্য জীবজন্তুদের। কিন্তু সে দোষ কিন্তু ডিয়েগোরও ছিল না।

—তবে?—অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর ন্যাকো।

—ডিয়েগোকেও নিয়ন্ত্রণ করত অন্য এক অনুজীবী। আমার ধারণা একধরনের অজানা ছত্রাক। যার প্রমাণ আপনারাও পাবেন ডিয়েগোর শরীরে। পরজীবীর মতো ডিয়েগোর শরীরে আশ্রয় নিয়ে ছিল। ওর চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল ওর শরীরে বাসা বেধে।

—আনবিলিভেবল। ইনক্রেবলে। হ্যাঁ, আমরাও ওর উপরে কিছু টেস্ট করব।

—আমার ধারণা চারনোবিলের রেডিয়েশনের মাত্রা অস্বাভাবিক হওয়ার জন্য এরকম নতুন ছত্রাক গড়ে উঠেছিল চারনোবিলে। সেই ছত্রাকই বাসা গড়ে ডিয়েগোর শরীরে। ডিয়েগোই ছিল ওই ছত্রাকের প্রাইমারি হোস্ট। হয়তো ওখানে গেলে আরও কেউ সংক্রামিত হতে পারে। ডিয়েগোর শরীরে ওই ছত্রাক পাওয়া গেলে আমাদের এ বিষয়ে ইউক্রেন সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হবে।

—যাক, আপনার জন্যই হয়ত আমরা আসল রহস্যের সন্ধান পাব। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের দেশে এসে যে আপনাকে এরকম বিপদে পড়তে হল, তার জন্য আমার খারাপ লাগছে।—বলে উঠলেন ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর।

আমি বলে উঠলাম,—আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে কি হবে। ধন্যবাদ দিন ডেভিডকে। যে আমাকে উদ্ধার করল ওই ঘর থেকে।

বলতে গিয়েই থেমে গেলাম।

ডেভিডকে কেন ডিয়েগো নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না? এ প্রশ্নটা আগে মাথায় আসেনি কেন! ডিয়েগো তো যথেষ্ট সময় পেয়েছিল।

৩০ সেপ্টেম্বর, কল্যাণগড়

আজ সকালে ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছি। তখন থেকে মন খুব খারাপ। খুব ভালো লোক ছিল। মাদ্রিদের একটা নামকরা হাসপাতালে মারা গেছে। নামী ডাক্তাররাও কিছু করে উঠতে পারেনি। তবে আমার অনুমান ঠিক। ডিয়েগোর মতো ওর মধ্যেও ওই এক ছত্রাকের ইনফেকশন পাওয়া গেছে। ছত্রাক মারা যাওয়ার আগে তার বসতিও ধ্বংস করে গেছে।

সেদিন পুলিসের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ খেয়াল হল ডিয়েগো কেন ডেভিডকে প্রভাবিত করতে পারেনি! একটু ভাবতেই আসল উত্তরটা খুঁজে পেলাম। এর পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে।

ওই বিশেষ ছত্রাক বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নতুন হোস্ট দরকার। বিশেষ করে এমন এক হোস্ট যে এরকম আন-ম্যানডস্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছে। ঠিক সে জন্যই প্রথম রাতে ওই ছত্রাক চলে আসে ডেভিডের শরীরে। ডিয়েগোর মাধ্যমে। সেজন্যই ডেভিডের ঘরে ডিয়েগো এসেছিল।

এসেছিল তার নতুন বাড়ি, বসতি খুঁজতে। আরও ক্ষমতাশালী হোস্ট খুঁজতে। হয়তো এরকম কিছু হোস্টের মাধ্যমে মানব জগৎকে আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ করত শুরু করত ওরা।

এটুকু বলতে পারি সেই চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ করে এসেছি। কিন্তু ওরা আসবে। ওরা আবার খোঁজ করবে নতুন শিকারের। ওরা শিকারের অপেক্ষায় থাকবে ওদের ওই চারনোবিলের রাজত্বে।

কিন্তু আমিও বসে থাকব না। আমাকে জানতে হবে ওদের কোষীয় গঠন। আমার ল্যাবে আমি এমন ন্যানোবট তৈরি করতে চলেছি, যারা ওদের ধ্বংস করবে ওদেরই কৌশলে, ওদেরই খেলায়।

প্রশ্ন হতে পারে আমি ওই ফাঙ্গাস পাব কোথায়?

আমি নিজে জানি আমার মধ্যেও ওরা আছে। আমিও ওই বিশেষ ছত্রাকের শিকার। তবে আমাকে ওরা এখনও কাবু করতে পারেনি। পারবেও না।

ড্রয়িং রুমে আমার ফোন রিং হচ্ছে। বলে উঠি—গণেশ, দেখো তো কার ফোন?

খানিকবাদে গণেশের উত্তর আসে।

—স্যার, অনিলিখা ফোন করছে।

—অনিলিখা?

অনিলিখার ফোন ধরতে উঠে যাই সঙ্গে সঙ্গে।

ফোন ধরে বলে উঠি—কী ব্যাপার অনিলিখা? কোনও খোঁজখবর নেই গত দুই সপ্তাহ। কোথায় তুমি?

কিন্তু ওর কথা স্পষ্ট শোনা গেল না। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে।

—কী বলছ? শুনতে পাচ্ছি না? তুমি কোথায়? তোমার দিকের নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু অস্পষ্ট কথা ভেসে এল উলটো দিক থেকে।

—নাহ, কোথায় আছো বলো তো? কিসের বিল?

এতক্ষণে একটু যেন কথা শোনা গেল উলটোদিক থেকে।

—মিস্টার পাই, আমি ইউক্রেনের চারনোবিল থেকে বলছি।

—সর্বনাশ। চারনোবিল?

—হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই ফোন কেটে যাওয়ার আগে। এখানে আমরা খুব দরকারি অভিযানে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যে তিনজন এসেছিল, তাদের সবাই গতকাল থেকে নিখোঁজ। আমি এখন এখানে একটা জায়গায়—

ফোন কেটে গেল।

—হ্যালো, অনিলিখা, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ?

কোনও উত্তর এল না।

শুধু একটা রাত



১
ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম আলাপ

আমার নামটা কনফার্ম করার পরেই ফোনের উলটোদিকের ভদ্রলোক বলে উঠলেন—

—তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। তাই তুমি বলেই বলছি। একজনের কাছে শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব ভালো ভয়ের গল্প লেখো। সেটা শুনে তোমার কয়েকটা বই জোগাড় করে পড়েও ফেললাম।খুব ভালো লাগল। তবে কিছু মনে করো না ভাই, তেমন ভয় পেলাম না।

আমি অবাক হলাম ফোনটা পেয়ে। ইংল্যান্ডের নাম্বার থেকে ফোন। গলা শুনে মনে হচ্ছে উলটোদিকে বেশ বয়স্ক একজন মানুষ। কথা বলার ধরনে শিক্ষার ছাপ। ধীরেসুস্থে কথাটা বললেন। বলার মধ্যে বিনয়ও আছে, আবার আত্মবিশ্বাসও আছে। উচ্চারণে সামান্য ইংরেজি টান। কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছেন।

সবথেকে বড় কথা ইংল্যান্ডে থেকেও সাম্প্রতিককালের বাংলা গল্প পড়েন। আমার বাংলা গল্প পড়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ করে এরকম ফোন! কিছু বলার আগেই ফের বলে উঠলেন—

—ভয় যদি সত্যি পেতে চাও, তাহলে একদিন আমার বাড়ি এসো। শুধু একটা রাত থাকতে হবে। রোজ যখন ঘুম ভাঙে, অবাক হই যে আরেকটা রাত কাটিয়ে এখনও বেঁচে আছি। ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। ভয়ের গল্প ঠিক সেরকম হবে। সেই ভয়ের শিহরণ যেন বেশ কিছুক্ষণ পাঠকের সঙ্গে থেকে যায়। শেষ করার পরে বুকে হাত দিয়ে দেখতে হবে হার্টবিট ভয়ে থেমে গেছে কিনা! তা না হলে আর কী ভয়ের গল্প!

একটু থেমে ভদ্রলোক ফের বলে উঠেছিলেন—

এসো। যদি বেঁচে ফেরো, তবে তুমি সত্যিকারের ভয়ের গল্প লিখতে শিখবে। ভয়ের গল্প লেখার জন্য ভয়কে খুব কাছ থেকে দেখা দরকার। কেন? তা আগে বলব না। একটাই কথা শেষের তিন মাইল একটু শক্ত রাস্তা। আর সেখানে কোনও মানুষ থাকে না।

যেন 'মানুষ' এই শব্দটার উপরে একটু বেশ জোর দিয়েছিলেন। কেন সেটা এখন বেশ বুঝতে পারছি।

আমার সামনে এখন সেই শেষের তিন মাইল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দূরে গাছগাছালির মাথার উপর দিয়ে সে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেরকম বলেছিলেন। কিন্তু একটু শক্ত পথ? এ তো সামনে সেরকম কোনও পথই নেই! শুধু জঙ্গল।

একটু খোঁজাখুঁজি করার পরে সেই পথ খুঁজে পেলাম।

একটা পায়ে হাঁটা সরু মাটির পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে এতটা পথ এগোতে হবে? এ পথ কি আদৌ ওই বাড়ি অব্দি যাবে? আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা বেশ উঁচু জায়গা। সমতল পাহাড়চূড়া বা হিলটপ। তাই চারদিকে বেশ দূর অব্দি দেখা যাচ্ছে।

এখান থেকে কিছু দূর অব্দি গাড়ির রাস্তা ছিল। গাড়িতে এসেছি। সেখান থেকে মিনিট তিনেক হেঁটে এই উঁচু জায়গাটায় এসেছি। এখান থেকে বাড়িটা খেয়াল করলে দূরে দেখা যাচ্ছে। চারদিকের সবুজের মধ্যে প্রায় একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাতের আকাশে শুকতারার মতো।

এবারে ভদ্রলোকের পরিচয় করাই। স্যার বীরেন ঘোষ। ফোন করার পরে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। যেখান থেকে আমার ফোন নাম্বারও খোঁজ পেয়েছিলেন, সেটাও ভদ্রলোক বলেছিলেন। গতবছর ওয়েলসের 'লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল'-এ লেখক হিসেবে ডাক পেয়েছিলাম অংশগ্রহণ করার। সেখান থেকেই বীরেনবাবু আমার খোঁজ পেয়েছিলেন।

বীরেনবাবু বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ, বা অ্যানথ্রোপলজিস্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন অক্সফোর্ডে পড়াতেন। ইংল্যান্ডে প্রায় ষাট বছর আছেন। এ বিষয়ের উপরে অনেক বইও লিখেছেন। তবে অবসর নেওয়ার পর থেকে সবকিছুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। অ্যানথ্রোপলজির উপরে বেশ কিছু প্রামাণ্য বই ওঁর লেখা। বিখ্যাত প্রফেসার ছিলেন। কিন্তু এখন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন।

সেদিনের পরে আরও দুবার ফোনে কথা হয়েছে। খুব সদাশয় ভদ্রলোক। কথা বলতে বেশ লাগে। প্রাজ্ঞ মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা।

শুনলাম ক্লাস সেভেনে থাকতে এদেশে এসেছিলেন বাবার সঙ্গে ১৯৬০ সালে। সেদিক দিয়ে বয়স সত্তরের উপরে হবে। ওঁর মার ছিল বাংলা বই পড়ার নেশা। সে নেশা বীরেন বাবুর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। এখনও খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন জায়গা থেকে বই নিয়ে আসেন। সে সূত্রে আমার বাংলা ও ইংরেজি দু ধরনের লেখার সঙ্গেই ওঁর যথেষ্ট পরিচিতি আছে।

আমি অবশ্য ওঁর মতো বেশিদিন এখানে নেই। ইংল্যান্ডে এসেছি বছর পাঁচেক। এখন এখানে থেকেই লেখা চালিয়ে যাচ্ছি। কর্মক্ষেত্রে অন্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেও কয়েক বছর ধরে আমার লেখক হিসেবে বেশ নামডাক হয়েছে। এখানে ও সুদূর বাংলায়। বিশেষ করে ভয়ের গল্পের ক্ষেত্রে।

তা সে কথা যাক। বাড়ির সম্বন্ধে উনি অবশ্য বেশি কিছুই বলেন নি। কেন ওই কথাগুলো বলেছিলেন, কেন ভয় পাব, সে ব্যাপারেও কিছু বলতে চান নি। শুধু বলেছিলেন যে শেষ মাইল তিনেক হেঁটে যেতে হবে। আর কোথায় গাড়ি পার্কিং করতে হবে সে জায়গাটার ঠিকানা আর পোস্টকোড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক সেরকম নির্দেশমতোই এসেছি।

একটু অবাক হয়েছিলাম। এখানে থাকেন, অথচ গাড়ি ব্যবহার করেন না! শুনেছিলাম বেশ কয়েকবছর উনি বাড়ির কর্মচারীদের উপরেই নির্ভর করেন বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। নিজে বেরোন না। কিছু ঘোড়া আছে। নিতান্ত যাওয়ার দরকার হলে, তাতে চড়েন। শুনেছি এখনকার সভ্যতার আর প্রযুক্তির থেকে সবরকম সম্ভাব্য দূরত্ব উনি রাখেন।

এসব শোনার পরে আর ওঁর অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারিনি। ওখানে গিয়ে ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতা না হোক, এখনকার দিনে এরকম এক ইন্টারেস্টিং ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ কে ছাড়ে!

২
সেই বাড়ির পথে

ওই পথে ঢোকার আগেই দেখলাম বন দপ্তরের সতর্কবার্তা। এখানে বিষাক্ত অ্যাডার সাপ আছে। সে থাকুক গে! আমার মতো ভারতের গ্রামবাংলায় যারা বড়ো হয়েছে,তারা অন্তত এসব সাপ-এ ভয় পায় না।

সে পথ দিয়ে এগোলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছু লোকের নিশ্চয়ই যাতায়াত আছে। হয়ত ওঁর বাড়িতে যারা কাজ করে, তারাই এ পথে যাতায়াত করে। বেশকিছু জায়গায় জল-কাদায় মাটির রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। আগস্ট-এর শেষ দিক। নীল ল্যাভেন্ডার, সানফ্লাওয়ারও আরও নানান ধরনের অচেনা জংলী ফুল। সারি দিয়ে হথহর্ন গাছ। সেখানে ছোট ছোট কুলের মতো অজস্র লাল বীজ হয়েছে।

পথে বেশ কয়েকটা ব্ল্যাকথরন গাছও পড়ল। সেখানে আবার থোকা থোকা নীল ব্লুবেরীর মতো বীজ হয়েছে। বেশ কিছু গাছে আপেল ও পিয়ারও হয়েছে।

কিছু গাছের পাতায় রঙের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। চেস্টনাট গাছগুলো লালচে হলুদ পাতায় সেজে উঠেছে।

এক মাইল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার পরে একটা খোলা উপত্যকায় এসে পড়লাম। সেখানে উঁচুনিচু রাস্তা। ঘাসজমির মধ্যে দিয়ে। সে পথ দিয়ে এগোলাম আরও বেশ খানিকটা পথ। অ্যাডার সাপ-এর দেখা পেলাম না বটে, কিন্তু পথে কয়েকটা হরিণ, খরগোশ আর কাঠবেড়ালীর দেখা পেলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পরে বাড়িটার কাছাকাছি এলাম। বিকেল ছ'টা বাজে। এখনও যথেষ্ট আলো আছে। পুরো বাড়ির ধার দিয়ে পাথরের দেওয়াল। এরকম প্রাচীর আমি আগেও দেখেছি। অনেক পুরনো এলাকায় থাকে। পরপর শুধু সরু সরু পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এরকম দেওয়াল টিকে থাকে।

প্রাচীরের পাশ দিয়ে খানিকটা হেঁটে বাড়ির সামনের দিকে এলাম, যেখানে বাড়িতে ঢোকার বড় গেট। ভেজানো ছিল। ঠেলতে খুলে গেল।

বাগানের মধ্যে দিয়ে চওড়া নুড়ি বাঁধানো পথ। নুড়ি বাঁধানো পথ এসে একটা ঘাসের লনে শেষ হয়েছে। তারপরে বিশাল বাড়ি। ডানদিকে বাড়ির পাশে একটা প্যাডক আছে। সেখানে কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু এরকম একটা সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন জায়গায় এত বড় জায়গা জুড়ে শুধু একটাই কাঠের বাড়ি!

বাড়ির ছোট কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরে কোনও কলিংবেল নেই। আশ্চর্য। ধাক্কা দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রোগা ছোটখাটো চেহারার এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। স্যার বীরেন ঘোষ।

চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। তার আড়ালে উজ্জ্বল চোখ। তীক্ষ্ন দৃষ্টি। কিন্তু একই সঙ্গে চোখে যেন কিরকম ক্লান্তির চিহ্ন। যেন ভালো করে ঘুম হয়নি। এক গাল কাঁচাপাকা দাড়ি। বয়স সত্তরের উপরে হলেও দেখেই বোঝা যায় বেশ সুস্থ।

এক গাল হেসে বাংলায় বলে উঠলেন—তুমি এতো কষ্ট করে এসেছো। খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে। শুধু আমি নই। পুরো বাড়ি তোমার অপেক্ষায় বসে আছে।

কেন শেষের কথাটা বললেন সেটা অবশ্য আমি বুঝলাম না।



৩

অবশেষে সেই বাড়িতে

আমি ওঁর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকে এলাম। ঢোকার পরেই একটা বেশ বড় লবির মতো জায়গা। সেখানে একটা দেরাজ, একটা বড় প্রায় দেড় মানুষ হাইটের একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। সেখান থেকে চওড়া ওক কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। লবির মতো জায়গাটার পরে চওড়া প্যাসেজ। তার দু'দিকে ডাইনে বাঁয়ে ঘর।

আমরা ডানদিকের প্রথম ঘরে ঢুকলাম। বিশাল ঘর। নিচু ছাদ। ওপরে চওড়া চওড়া ওক কাঠের বীম। এ ঘরের বয়স দুশোর কম হলে অবাক হব। দূরে একটা বিশাল ফায়ার প্লেস। তাতে আগুন জ্বলছে। ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন কাঠের তাক করা। সেখানে ও ফায়ারপ্লেসের উপরে ছোটখাটো নানান জিনিস রাখা। সেসব মূর্তি, সেরকম ছবি আমি আগে কোথাও দেখিনি। অদ্ভুত দর্শন কিছু নারী-পুরুষের ছবি। তাদের কারুর নাক বেজায় লম্বা, কারো মাথায় টুপি। কারো আবার বিশাল লম্বা কান, কারো আবার ডানা আছে।

পায়ের নীচে পাথরের মেঝে। পাশে একটা বড় জানলা। রঙিন স্টেনড গ্লাসের, অনেক চার্চে যেমন থাকে।

আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে নিজে ডান পাশের অন্য সোফায় বসলেন।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলে উঠলাম—আপনার সঙ্গে এ বাড়িতে কে থাকেন?

—কেউ না। আমার দুজন কর্মচারী আছে। তারা সকালে এখানে চলে আসে। বিকেল পাঁচটা অব্দি থাকে। তারপরে চলে যায়। রাতে একাই থাকি।

—আপনার সন্ধ্যে বেলা-রাতে এখানে একা থাকতে ভয় লাগে না?

কোনও উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—তা আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? জঙ্গলের মধ্যে এমনি কোনও অসুবিধে নেই। ওই অ্যাডার সাপ কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হয়, এই আর কি!

যেন ব্যাপারটা বেশ স্বাভাবিক এমনভাবেই বললেন।

সামনেই টেবিলে কফির পট রাখা। সেটা দেখিয়ে বলে উঠলেন

—কফি চলে তো?

সম্মতি জানাতে দুটো কাপে কফি ঢেলে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আবার বলে উঠলাম—আপনি একা এরকম একটা জায়গায় থাকেন। কোনও অসুবিধে হয় না!

কফির কাপে চুমুক দিয়ে যেন একটু রহস্যজনকভাবে তাকালেন আমার দিকে।

তারপরে মৃদুস্বরে বলে উঠলেন—আসলে আমার চিরকালই ইচ্ছে ছিল এরকম খুব পুরনো কোনও ম্যানর হাউসে থাকার। সামর্থ্যে কুলোচ্ছিল না। ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ এরকম ক্যারেকটার হাউসের বাড়ির দাম হয় কমপক্ষে দুই থেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড। ক্যারেকটার হাউস মানে বোঝো তো? এর অর্থ হল এমন একটা বাড়ি যে বাড়ি সেই জায়গার বা সেই সময়ের চরিত্রকে ধরে রেখেছে।

হঠাৎ করে এ বাড়িটা পেয়ে গেলাম জলের দরে। তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না। এমনিতে আমি অকৃতদার। সারাজীবন একা একা কাটিয়েছি। তবে কাটিয়েছি অক্সফোর্ডের মতো অপেক্ষাকৃত জনবহুল জায়গায়। এরকম নিরিবিলি জায়গায় থাকার ইচ্ছে ছিল। চলে এলাম।

—আপনি বলার পরে বুঝেছিলাম যে এ জায়গাটা লোকালয়ের বাইরে। কিন্তু এতটা নির্জন বুঝিনি। এখানে মনে হল না আর কোন বাড়ি আছে! এরকম জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ করে আলাদা একটা বাড়ি!

—আসলে এখানে মধ্যযুগে একটা গ্রাম ছিল। সে তেরশো সালের কথা। এই বাড়িটা সেই সময়ের। পরে বিশেষ কিছু কারণে এখানকার জনবসতি উঠে যায়। আশেপাশের সব কিছু জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। গ্রামের সব রাস্তাও আস্তে আস্তে গাছের দাপটে হারিয়ে যায়। এই যে তুমি এলে সেটাও সেরকমই একটা পথ ধরে। দূরে একটা চার্চের ধ্বংসাবশেষ দেখবে। এ গ্রামকে এখন শুধু মানুষ নয়, সময়ও যেন ভুলে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক।

খেয়াল করে দেখলাম আমার ফোনে নেটওয়ার্ক নেই। ওটার দিকে বারবার তাকাচ্ছি দেখে বীরেনবাবু হেসে বলে উঠলেন—ওসব জিনিস এখানে চলবে না। এখানে কোনও নেটওয়ার্ক নেই।

—সে কি? মানে? নেটওয়ার্ক নেই? এখনকার দিনে এরকম কোনও জায়গা থাকতে পারে! তাও ইংল্যান্ডে!

—এরকম জঙ্গলের মধ্যে কোথায় নেটওয়ার্ক! একদিক থেকে ভালো। কোনও উপদ্রব নেই। পড়াশোনার ক্ষতি করে। আমার একমাত্র সঙ্গী এখানে বই। আমার কর্মচারীরা আমার প্রয়োজনমতো বই নিয়ে আসে। পড়ি।

বলে একটু থেমে কিছু দূরে একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপরে রাখা একটা আদ্যিকালের টেলিফোনের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন—বুঝলে, ওটাই হল আমার আর বাইরের মনুষ্যজগতের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। তাও মাঝেমধ্যে ঝড়জল হলে ওটা বিগড়ে বোবা হয়ে যায়।

—কিন্তু এখানে গ্রাম ছিল বলছিলেন না? সেটা হারিয়ে গেল কেন? এখানে এখন আর কোনও জনবসতি নেই কেন?

—বলছি। 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন'—মার্ক টোয়েন বলেছিলেন। এখানে সেরকমই ঘটনা। তবে তার আগে তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। একটু রেস্ট নিয়ে নাও। তারপরে আরামসে আড্ডা মারা যাবে। আমি একটু তাড়াতাড়ি ডিনার করি। সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিনার করলে তোমার কোন অসুবিধে নেই তো?

—না, না। একদম ঠিক আছে। আমিও রাতে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই।

—বাহ। তবে চলো। তোমাকে তোমার ঘর একটু দেখিয়ে দিই।

—আপনি আবার আমার সঙ্গে যাবেন কেন? আপনি বলে দিলেই আমি দেখে নিচ্ছি।

—আরে না-না, সারাদিন এভাবে হাঁটাচলা করেই তো নিজেকে সুস্থ রেখেছি। তাছাড়া তুমি হলে আমার অতিথি। প্রথম এ বাড়িতে এসেছ।

আর আপত্তি করলাম না। আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। আমার ঘর দেখিয়ে বাড়ির কোথায় কী আছে সংক্ষেপে জানিয়ে আবার চলে গেলেন।

আমার শোওয়ার ঘরটা দোতলায় বাড়ির সামনের দিকে। বেশ বড় ঘর। এক দিকের দেওয়াল জুড়ে বড় কাচের জানলা। ঘরে একটা দেওয়াল-আলমারি, একটা বড় হাতলওয়ালা চেয়ার, একটা দেরাজ আর একটা পুরনো দিনের ডিজাইনের কাঠের কারুকাজ করা খাট। ঘর বেশ পরিপাটি করে সাজানো। পায়ের নীচে পুরু সাদা কার্পেট। মাথার উপরে এ ঘরেও মোটা ওক কাঠের বীমের ভরসা।

জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। সামনের দিকের ঘাসের লন, নুড়িপথ দেখা যাচ্ছে। তারপরে এ বাড়ি ঘিরে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাইন, সিলভার বারচ, ওক, চেস্টনাট, উইলো, এলম, ম্যাপল গাছের সারি। যদ্দূর দেখা যায় শুধু গাছের মাথা। বহু দূরে আবছা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সে পাহাড়ের ঢেউ যেন নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ, রহস্যময়।

এরকম জায়গায় ভদ্রলোক একা রাতে থাকেন কি করে জানি না! খুব সাহসী লোক না হলে এখানে এক রাতও থাকা সত্যি সম্ভব নয়।

তবে তার জন্যে আমার আদর আপ্যায়নের কোনও খামতি নেই। আমার ঘরে টেবিলের উপরে আপেল, কিউই, চেরী সাজিয়ে রাখা আছে। আগে থেকেই এসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাথরুমে গিয়েও দেখলাম ভদ্রলোক ছোটখাটো সব ব্যাপার আগে থেকেই ভেবে গুছিয়ে রেখেছেন।

জামাকাপড় পরিবর্তন করে, বিশ্রাম নিয়ে, এক ঘণ্টা বাদে নীচে ড্রয়িংরুমে ফিরে এলাম।

৪
বীরেনবাবুর সঙ্গে আড্ডা

বীরেনবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। নামতেই বললেন—চলো সবার আগে ডিনার করে নিই। তারপরে গল্প করা যাবে।

ডিনার করার আগে আমাকে বাড়ির একতলার ঘরগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আগে খেয়াল করি নি। বাড়ির পিছন দিকে কিছুটা দূরে একটা চ্যাপেলও আছে। বাড়ির থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা পাথরের রাস্তা চ্যাপেলের দিকে এগিয়ে গেছে। আমাকে ওই চ্যাপেলে নিয়ে গেলেন উনি। চ্যাপেলের ছাদ খুব উঁচু। প্রায় দোতলার বাড়ির মতো উঁচু ছাদ। ওক বীম-এর উপরে ছাদ দাঁড়িয়ে আছে। একটা দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল রঙিন কাচের জানলা। কিছু ভাঙাচোরা জিনিস ঘরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখা আছে। দেখেই বোঝা যায় এই চ্যাপেল এখন আর কোনও ভাবে ব্যবহৃত হয় না।

উনি বলে উঠলেন—আমার মনে হয় একটা সময়ে এই পরিবার গ্রামের চার্চে যেতে পারত না। তখন এই প্রাইভেট চ্যাপেল বানিয়েছিল। এখানেই হয়তো তারা প্রার্থনা করত।

—কেন এ পরিবার চার্চে যেতে পারত না?

—কিছু ঘটনা ঘটেছিল সে সময়ে। ডিনারের পরে সেসব কথা বলছি।

আবার বাড়িতে ফিরে এলাম। এবারে উনি আমাকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। ওঁর পড়ার ঘরটা অনেক লাইব্রেরীকে হার মানাবে। বাড়ির মধ্যে সবথেকে বড় ঘর। এই ঘরে আলো বেশি ঢোকে না। ঘরের বাতাসে যেন পুরনো বই এর গন্ধ মিশে আছে। সার দিয়ে দু সারি চওড়া চওড়া বুক কেস। অনেক বই বেশ পুরনো।

১৮৫০ সাল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন নিউজপেপার, ইকনমিস্ট এর মতো ম্যাগাজিন বই হিসেবে বাঁধিয়ে সার দিয়ে রাখা আছে। দেখার মতো কালেকশান।

আমাকে বলে উঠলেন—সব বই আমার নয়। আমি যার কাছ থেকে কিনেছিলাম, তারা এখানে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ছিল। বাড়ির সঙ্গে তাদের সব বইও পেয়েছিলাম। ওরা আর নিয়ে যেতে চায় নি।

আমি বইগুলো কাছ থেকে গিয়ে দেখলাম। প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই আছে এখানে। কিছু লাল শালুতে মোড়া। বেশ কিছু বই চামড়া দিয়ে বাঁধানো। বুঝতে পারছিলাম এর আগে যারা এখানে ছিল, তাদেরও বই-এর শখ ছিল খুব। এরকম কালেকশন চট করে হয় না।

একটা চামড়ায় বাঁধা খুব পুরনো বই চোখে পড়ল—'বুক অফ ডেমোনোলজি' কিং সিক্সথ জেমস-এর লেখা।

হাতে নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি দেখে বীরেনবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন—এখানে এলে আর এসব বই-এর দরকার পড়ে না। তবে এটা খুব রেয়ার মহা মূল্যবান একটা বই। আমি যদ্দূর জানি এর বাইরে ঠিক আর চারটে বই আছে। তার মধ্যে কোনটাই প্রাইভেট কালেকশনে নেই। সবই ইউনিভারসিটির লাইব্রেরীতে। এটা স্কটল্যান্ডের রাজা সিক্সথ জেমস যাকে আমরা ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস বলে চিনি, তার লেখা। ১৫৯৯ সালে লেখা। এর আরও দুখণ্ড আছে। এখানেই আছে। শয়তান, ডাইনি, নেকড়ে মানুষ—এসব ব্যাপারে কী করা উচিত তা নিয়ে লেখা।

—কী অবস্থা! সে সময়ের রাজা এসব বিষয়ের উপরে লিখছেন।

—তার মানে ভাবো তখন সাধারণ মানুষের মনে এসবের উপরে কতটা বিশ্বাস ছিল! তাই রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে জ্ঞান না থাকলে সে রাজার দক্ষতা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন উঠত। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথও কিন্তু এই বই-এর দ্বারা প্রভাবিত।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—তবে এখানে থাকলে এসব বই লাগবে না। এক রাতে অনেক বেশি জেনে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বই থেকে মুখ সরিয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম মুখে সেই রহস্যময় হাসি। চশমার উপর দিয়ে সেই দৃষ্টি।

ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা ঘরে ঢুকলাম। তারপরে আরেকটা ঘরে। টি রুম। কার্ড রুম। কীচেন। ডাইনিং। একটা শোয়ার ঘর। একটা বড় কনজারভেটরি। রুমের পরে রুম। শুধু কোথাও কোনও লোক নেই।

রান্না রেডী ছিল। দুজনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিলাম। দেখলাম বীরেনবাবু এখনও ভারতীয় খাবারই খান। তবে সেরকম এলাহি কিছু আয়োজন নয়। ভাত, ডাল, ফুলকপির তরকারি, চিকেনকারি, স্যালাড।

খাওয়ার পরে আমরা বাইরে বাগানে এসে বসলাম। রাত এখন প্রায় সাড়ে আটটা। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে ভারী সুন্দর সোনালি আলো। সেই আলো গাছগুলোর ওপরের দিকের ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরফেরা পাখিদের ডাকে চারপাশ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিন্তু তার বাইরে কোনও শব্দ নেই। মনে হচ্ছে ওরা যে মুহূর্তে ওদের ডাক থামাবে এ বাড়ি যেন ফের ফিরে যাবে মধ্যযুগীয় নীরবতায়।

—এদিকটা এমনিতে দিনের বেলা খুব নির্জন। রাতের দিকে জমজমাট।—কীরকম যেন হঠাৎ করে বলে উঠলেন বীরেন বাবু। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠলেন—এখানে আমার নিকটতম প্রতিবেশীরা সবাই মাটির নীচে থাকে। চারদিকে ঘন জঙ্গল থাকায় মাঝেমধ্যে ফেন্সের আর পাথরের পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে হরিণ, শেয়াল, খরগোশ এসে ঢোকে। হয়তো আরও অজানা কিছু প্রাণী এসে ঢোকে। তবে বাড়ির মধ্যে ঢোকে না।

আমার দিকে এবারে গভীরভাবে তাকালেন ভদ্রলোক। বুঝতে পারছি উনি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। ভৌতিক গল্পলেখকরা কল্পনাপ্রবণ হতে পারে, কিন্তু তাদের হার্ট যথেষ্ট মজবুত হয়। তাই আমাকে ভয় পাওয়ানো অত সহজ হবে না।

উলটে আমি প্রশ্ন করে উঠলাম—আপনার ভয় লাগে না? বিশেষ করে সন্ধের পরে? কাছাকাছি কোনও লোকজন নেই। চুরি ডাকাতি হয় না এদিকে?

হেসে উঠলেন।—চুরি, ডাকাতি? এ এলাকায় রাতের পরে আসার মতো বুকের পাটা কারুর নেই। এখানে এখন কিছু নেই। কিন্তু যারা ছিল, তারা কেউ ছেড়ে যায়নি।

বুঝতে পাচ্ছিলাম। উনি আমাকে আরও উস্কে দিচ্ছেন। যাতে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করি। কিন্তু তার থেকেও বড় একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল। এখানে এতটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল গ্রাস করেছে একটা পুরনো দিনের পরিত্যক্ত গ্রামকে।

কারুর সে গ্রামকে পুনরুদ্ধারের আগ্রহ নেই! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সব জায়গা আবার করে গড়ে তোলা হয়। ইতিহাসকে এত সহজে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। কিন্তু এর বেলায় ব্যতিক্রম কেন?

জিজ্ঞেস করে উঠলাম—আচ্ছা, এখানে যে গ্রাম ছিল, তা উঠে গেল কী করে?

—শুধু গ্রাম নয়, বলা যায় ১৩০০ সাল নাগাদ এটা ছিল এক ব্যস্ত জনপদ। বিউবোনিক প্লেগের কথা শুনেছ তো? যাকে ব্ল্যাক ডেথও বলা হয়।

—হ্যাঁ, ইংল্যান্ডের কিছু জায়গায় হয়েছিল শুনেছি। ১৩৫০ সাল নাগাদ।

—ঠিক বলেছ। একদম ঠিকভাবে বলতে গেলে এসেছিল ১৩৪৮ সালের মাঝামাঝি। এখানেও সে মড়ক লেগেছিল। শুনেছি প্লেগে এত লোক মারা যায় এ গ্রামে যে ১৩৫০ সালের পরে সামান্য কিছু পরিবার বেঁচেছিল। তখন থেকেই আস্তে আস্তে এ এলাকা বিস্মৃতি আর জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। হয়ত সত্যি কারো শাপ লেগেছিল।

—কার শাপ? আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

—না, আমার মধ্যে কোনও কুসংস্কার নেই। অন্তত এখানে আসার আগে ছিল না। তবে এখন জানি না কেন মনে হয়, হতেও পারে! সব রহস্য বিজ্ঞান কোনওদিন সমাধান করতে পারবে না। পরে বলছি। রাত এখনও অনেক বাকি।

—কিন্তু আপনি এসব কী করে জানলেন?

—কিছুটা শোনা কথা, কিছুটা লাইব্রেরীর আর আমার বাড়ির বই পড়ে। কিছুটা পুরনো ঐতিহাসিকদের সঙ্গে কথা বলে।

বীরেনবাবু এবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আমার লেখালেখি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। বাংলা সাহিত্যে এখন কীরকম লেখা হচ্ছে, আগেকার লেখকদের সঙ্গে এখনকার লেখার ধারায় কোথায় তফাত-ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ।

বুঝলাম ভদ্রলোক এখানে থাকলেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ধরে রেখেছেন। একই সঙ্গে সাংঘাতিক স্মৃতিশক্তি। বিভূতিভূষণের 'অশনি সঙ্কেত' এর মতো উপন্যাসেরও সব চরিত্রের নাম মনে রেখে দিয়েছেন।

আড্ডা বেশ জমে উঠেছে, এরকম সময়ে উনি হঠাৎ বলে উঠলেন—

চলো রাত প্রায় ন'টা হয়ে এল। আর বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

—হ্যাঁ, এখনই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। সেপ্টেম্বর শুরু হল না। এখনই ঠান্ডা পড়ে গেছে।

উনি চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে ফের সেই রহস্যময়ভাবে তাকিয়ে হেসে বললেন—আমি কিন্তু তার জন্য বলিনি। বলেছি না, এ জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয়!

এতক্ষণ গল্পে মেতে থাকায় খেয়াল করিনি। সত্যি চারদিক যেন হঠাৎ করে কিরকম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দিনের আলো মলিন হয়ে এসেছে। সবাই যেন একটা ঝড়ের অপেক্ষায় আছে। আশপাশ থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সঙ্গে একটা বুনো গন্ধ। মনে হয় কাছেপিঠে হরিণ বা শেয়াল আছে।

অন্ধকার হয়ে এলেও টের পেলাম যে মাথার উপরে মেঘশূন্য নীল আকাশ আর নেই। কালো মেঘের ভিড় বাড়ছে। এ বাতাস যেন শুধু ঠান্ডা নয়, কিরকম যেন শিরশিরানি মিশে আছে এ বাতাসে। হঠাৎ করে চারপাশের গাছগাছালি যেন ছায়ার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছে। যেন অস্তিত্বহীন এক গ্রাম, এক জঙ্গল পড়ে আছে চোখের সামনে। শুধু কাদের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে তিরতির করে কাঁপতে থাকা গাছের পাতায়।

আমি ওঁর সঙ্গে পিছু পিছু এগোলাম। ঢুকতে গিয়ে দেখি বাড়ির বাইরের দেওয়ালে একটা লাল ক্রস এর চিহ্ন। এটা আগে চোখে পড়েনি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সামনে থেকে বীরেনবাবুর তাড়া এল।

—দেরী করো না। ন'টা বাজতে চলেছে। এরপরেই ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে।



৫

রাত ন'টার পরে

আমরা এবারে ভেতরে এসে টিরুমে বসলাম। এই ঘরটার দু দিকে জানলা। বাইরের বাগান এখান থেকে বেশ ভালো দেখা যায়। এ ঘরেও ফায়ার প্লেস আছে। কাঠের আগুন থেকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে।

বাইরে বাগানে আলো জ্বলে উঠেছে। তবে তাতে আলোর থেকে ছায়াই হয়েছে বেশি।

বীরেনবাবু এবারে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। শুধু তাই নয়, টেবিলের উপরে রাখা একটা খুব সুন্দর কাচের মোমদানিতে মোমবাতি জ্বেলে দিলেন।

ঘরে আরও দুটো মোমবাতির আলো জ্বেলে বলে উঠলেন—এখানে আরেকটা সমস্যা হঠাৎ করে যেকোনো সময় বিদ্যুৎ চলে যায়। তুমি এখানে বসো। আমি বাড়ির আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। হুশ করে যখন আলো নিভে যাবে, তখন আর আলো জ্বালানোর সময় থাকবে না।

উনি ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সত্যি এটা ভেবে দেখি নি, বাড়ির সব ঘরে এত সুন্দর সুন্দর মোমদানি রাখা কেন! ইংল্যান্ডে অবশ্য লোডশেডিং হতে বিশেষ দেখি নি। তবে এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় কি হয়, সেটা জানা নেই। এমারজেন্সি লাইট থাকতে পারত। কিন্তু ভদ্রলোক যেন সেই মধ্যযুগের পরিবেশকেই ধরে রাখতে চেয়েছেন।

অবশ্য সেটা খানিকটা স্বাভাবিকও বটে। এরকম পরিবেশ ভালো না লাগলে উনি তো আর এখানে থাকতে পারতেন না।

এই ঘরটা খেয়াল করে দেখলাম। বেশ বড় ঘর। কিন্তু সে তুলনায় আসবাব কম। ঘরের মাঝে একটা ছোট গোলটেবিল। সেই টেবিলের দুদিকে দুটো বিশাল পুরনো দিনের ডিজাইনের দামি লেদার সোফা, যার একটাতে আমি বসে আছি।

ঘরের দেওয়ালের রং বেশ লাল। একটা জানলার সামনে কারুকার্য করা টেবিল। সেটাতেই মনে হয় বীরেনবাবু পড়াশোনার কাজ করেন। বেশ কিছু বই তার উপরে রাখা। আগের ঘরের মতো এ ঘরেও নানান অদ্ভুত জিনিস নানান জায়গায় রাখা আছে।

ঘরের কোণের দিকে রাখা একটা সুদৃশ্য কারুকার্য করা কাঠের বড় টেবিল আছে। তার উপরে নানান ধরনের জিনিস রাখা আছে। তার মধ্যে অন্য ধরনের দেখতে একটা কাঠের বোতলও আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম। দেখতে অনেকটা ছোট কুঁজোর মতো। ফাঁকা নয়। ভেতরে কিছু একটা তরল জাতীয় জিনিস আছে। বিদঘুটে গন্ধ। মনে হল সেই বোতলের মধ্যে ভারী পেরেক জাতীয় ধাতব জিনিস আছে। নাড়াতে ঠকঠক করে আওয়াজ হল। এরকম একটা তরল রাখার জন্য এত ভালো একটা কারুকার্য করা কাঠের পাত্র!

—আরে করেছ কী? সাবধানে রেখে দাও। পরে বলছি।

চমকে উঠে দেখি বীরেনবাবু ঘরে ঢুকেছেন। গলার স্বরে উদ্বেগ। বলতেই হবে বয়সের তুলনায় অত্যন্ত সুস্থ। এত হাঁটাচলা করেন। কোনও ক্লান্তি নেই।

—কিন্তু এটা কী?

—এটা হল ডাইনী বোতল। উইচ বটল।

—মানে?

—এটা হল ডাইনী আটকে রাখার একটা উপায়। মধ্যযুগীয় অ্যান্টি উইচক্রাফটের একটা পদ্ধতি। অর্থাৎ ডাইনী তাড়ানোর উপায়। এটা আমি এ ঘরের ফায়ার প্লেসের নীচে একটা লুকনো চেম্বারে খুঁজে পাই। খুব সাবধানে রাখা ছিল। তোমাকে দেখানোর জন্যে বার করে এখানে রেখেছি।

—কিন্তু ফাঁকা নেই তো? কি রেখেছেন এখানে?

হেসে বললেন,—পেরেক আছে। তরলটার কথা পরে বলছি। বুঝলে এটা হল ডাইনী আটকে রাখার উপায় যাতে বাড়িতে ভয়ে ডাইনী না ঢোকে। ঢুকলে বিপদে পড়ে যাবে।

—আপনি এসবে বিশ্বাস করেন?

—না করে উপায় কি! তুমিও আজ রাতের পরে বিশ্বাস করবে। দাঁড়াও, আরও কিছু জিনিস দেখাই।

বলে টেবিলের উপর থেকে একটা অদ্ভুত দর্শন জিনিস তুলে নিয়ে বলে উঠলেন—এটা কী বলতে পারো?

এক ফুট লম্বা একটা মানুষের হাত না থাকলে যেরকম চেহারা হয় সেরকম। কিন্তু মনে হয় কোনও গাছের শিকড়। বীরেনবাবুর হাতে যেটা আছে, তার মতো আরও কয়েকটা আছে এই টেবিলে। বিভিন্ন অদ্ভুত সব শেপের।

হাতে নিয়ে দেখলাম। দেখলেই কীরকম যেন অস্বস্তি লাগে। একটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও লোকের হাতের পাঁচটা আঙুল। হাতটা নীচের দিকে করে রাখা, তিনটে আঙুল ভাঁজ করা। তর্জনী কিছুর দিকে নির্দেশ করছে। একটা দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল হাঁ করা একটা মুখ কিছু গিলতে চাইছে। একটা যেন মাথা কাটা মানুষ। হাত পা সব আছে। শুধু ধড়ের উপরে মাথা নেই। আরও বেশ কয়েকটা। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই চেহারাগুলো এই আধো-অন্ধকারে বেশ ভীতিপ্রদ।

—কোনো গাছের শিকড়?

—ঠিক বলেছো। এগুলো হল ম্যান্ড্রেক গাছের শিকড়।

বলে উঠলাম।—আপনি কি এগুলো সংগ্রহ করেন?

—হ্যাঁ। বেশ কয়েকটা এ বাড়িতে আগে থেকে ছিল। সেগুলো দেখে আগ্রহ বাড়ে। তারপরে আরও কিছু সংগ্রহ করেছি 'স্টাও অন দ্য ওয়ালডে'র একটা অকশন হাউস থেকে। হাতে ধরলেই বেশ একটা শিরশিরানির ব্যাপার হয়। এক সময়ের উইচ ক্রাফটে-এর অনেক ব্যবহার ছিল। এগুলোর প্রত্যেকটাই অবশ্য বেশ পুরনো। ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

আমরা ফের সোফায় এসে বসলাম। এবারে আমাদের আলোচনার টপিক হল এখানকার প্রবাসী বাঙালি। বীরেনবাবুর ছোটবেলার কথা। বাংলাদেশে কাটানো সেসব অস্পষ্ট স্মৃতিকথা।

উনি ক্লাস ফোর অব্দি বাংলাদেশে পড়েছিলেন। বলছিলেন কীভাবে দাদুর প্রভাব পড়েছিল ওঁর উপরে। দাদুর কাছে উপকথার গল্প শুনে শুনে উনি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির মানুষের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তার থেকেই পরে এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ গড়ে ওঠে।

হঠাৎ এর মধ্যে ঘরের আলো নিভে গেল। ঘাসের লনে লাগানো বাইরের আলোও সব একসঙ্গে নিভে গেলো। কারেন্ট চলে গেছে। মোমবাতির আলো আছে বলে বাঁচোয়া। না হলে ঘরের মধ্যেও কিছু দেখা যেত না।

বীরেনবাবু হেসে বলে উঠলেন—কী সীট বেল্ট পরা আছে তো? এভাবেই ঝড় শুরু হয়। মাঝেমধ্যে এরকম সময়ে আলো চলে যায়। আগে ন্যাশনাল গ্রিডকে ফোন করে কমপ্লেন করতাম। এখন আর জানাই না। মনে হয় ওদেরও আয়ত্বের বাইরে। হয়তো এখানে আলো না থাকাই উচিত। যে অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছিল সাতশো বছর আগে, সেই অন্ধকার এখনও এখান থেকে কাটেনি।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—আমি প্রথমে এ বাড়ি কেন এত কম দামে পেয়েছিলাম, সেটা বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম।



৫
এ বাড়ির অভিশপ্ত ইতিহাস

মোমবাতি জ্বলছিল। দেখলাম বীরেনবাবুর চোখের মণি যেন সে আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল।

ভদ্রলোক যেন কিছু একটা ভাবলেন।

তারপর একটু দ্বিধা নিয়ে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন—এই বাড়ির এক ইতিহাস আছে। অভিশপ্ত ইতিহাস। আমি নিজে আগে অবশ্য জানতাম না। ব্রিস্টল, অক্সফোর্ড ও লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরীর থেকে মধ্যযুগীয় কিছু বই পড়ে ও তারপরে এখানকার বিভিন্ন ঘটনাস্থলে ঘুরে কি হয়েছিল তার একটা আন্দাজ করতে পেরেছি। ইতিহাসে অনেক কিছুই লেখা হয় না। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষগুলোর বিপক্ষে যায়, এমন ঘটনা ইতিহাসে লেখা থাকে না। ইতিহাস সবসময় ক্ষমতাশালীদের পছন্দমতো কথা বলে।

কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক চার্চ আছে। এখন অবশ্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে তার শুধু ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। শুধু তার অল্টারটা এখনও খানিকটা টিকে আছে। তার পিছনের ভেঙে যাওয়া পাথরের দেওয়ালে পেয়েছিলাম এই ক্লার্ক পরিবারের কয়েকজনের নাম। খোদাই করে লেখা ছিল। সহজে পড়া যাচ্ছিল না। তার উপরে অক্ষরগুলো আবার উলটো সিকোয়েন্সে লেখা। তার নীচে যেন একফোঁটা চোখের জলের ছবি। তার মাঝবরাবর এক লম্বালম্বি লাইন।

-তার মানে? নাম না হয় চার্চে লেখা থাকতে পারে। হয়তো ক্লার্ক পরিবারের বড় কোনও অবদান ছিল। কিন্তু ওরকমভাবে লেখা কেন?

—ইংল্যান্ডে মধ্যযুগে ওই সিম্বলের অর্থ ছিল অভিশাপ। অর্থাৎ কেউ এই ফ্যামিলির উপরে এতটাই চটে ছিল, যে এদের শাপশাপান্ত করতেও ছাড়েনি।

—সে কি! চার্চে এরকম লেখা থাকত! নিশ্চয়ই চার্চেরই কেউ তাহলে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই না?

—ঠিক বলেছ। চার্চের অনুমতি না থাকলে এরকম অভিশাপ চার্চের দেওয়ালে লেখা থাকত না। আমাকে অবশ্য ওটা খুঁজে বার করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। আমার কাজই তো এসব নিয়ে। তাই আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছিল এই পরিবারের সম্বন্ধে জানার, খবর সংগ্রহ করার।

—তা আপনি কী সেই ক্লার্ক পরিবারের কারুর কাছ থেকে এ বাড়ি কিনেছিলেন?

—তা জানি না। আমি যার কাছ থেকে কিনেছিলাম, তাদের পরিবারের পদবী ছিল মিলার। তবে ১৫৩৮ সালের আগে ইংল্যান্ডে পদবী কিন্তু বংশপরম্পরায় সন্তানরা পেতো না। বরঞ্চ সে কি কাজ করত, তাই বোঝাতো। যেমন শিক্ষক বা পাদ্রী বা কোনও স্কলারের পদবী হত ক্লার্ক। পদবীর থেকে সে লোকটার কাজের পরিচয় পাওয়া যেত।

—তাই নাকি? এটা তো জানা ছিল না।

—হ্যাঁ, এর পিছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। ইংল্যান্ডে ১০৬৬ সালে নরমান আক্রমণের পর থেকে জনসংখ্যা হঠাৎ করে খুব বেড়ে যায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যোগাযোগ অনেক বেড়ে যায়। যার জন্য নামের সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাজের পরিচয় জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে ক্লার্ক পরিবারের কোনও ছেলে মিল বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করলে, তার নাম মিলার হয়ে যেতে পারে। তাই জানি না আমি যাদের কাছ থেকে কিনি, তারা একই পরিবারের কিনা। তবে আমার আরও কিছু লেখা পড়ে মনে হয়েছিল যে এই পরিবারের সঙ্গে গ্রামের কিছু প্রভাবশালী লোকেদের, বিশেষ করে চার্চের সম্পর্ক ভালো ছিল না। বলা যায় চার্চ এ পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল।

—কেন? হঠাৎ করে এরকম হওয়ার কারণ?

—এর কারণ পিটার ক্লার্ক ছিল খুব সাহসী ও পণ্ডিত মানুষ। ক্যাথোলিক ধর্মের কিছু গোড়ামিতে ওর আপত্তি ছিল। চার্চ যেভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিল, তার বিরুদ্ধেও কথা বলেছিল। অন্য দিকে

ক্লার্ক ফ্যামিলি যথেষ্ট অর্থবান হওয়ার জন্য ওদের বিরুদ্ধে সবার কিছুটা ঈর্ষাও ছিল। সে জন্যই হয়তো এরকম অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যাতে ওদের পরিবারের সর্বনাশ হয়।

—আপনি কি এসব জেনে কিনেছিলেন?

—না, এতসব জানা ছিল না। তবে কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু এ বাড়ি বা পরিবারকে কেন্দ্র করে যে এতকিছু একটা সময় ঘটেছিল, তা বুঝিনি। তবে যত জেনেছি, তত আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছি। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের লোকেদের আচার-ব্যবহার, সে সময়ের অন্ধবিশ্বাস—এসব নিয়ে আমার পড়াশোনাও ছিল। এ পরিবারের উপর কেন এত অত্যাচার হয়েছিল, সে রহস্য বুঝতে তা সাহায্য করেছিল।

ইতিমধ্যে সামনের টেবিলে উনি একটা দামি রেড ওয়াইনের বোতল দুটো বেশ ঐতিহাসিক-দর্শন ওয়াইনের গ্লাস এনে রাখলেন। হেসে বলে উঠলেন—খুব ভালো আর্জেন্টিনার পিনো নঁয়ার ওয়াইন। খেতে শুরু করো। এরকম এক রাতে একটু সাহস যোগাবে।

বলে উনি ড্রিংক করতে শুরু করলেন। একটু একটু করে গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিলেন। যেন কোনও তাড়া নেই। যেকোনও ভাবে এ রাত কাটিয়ে ওঠাটাই প্রধান। মাঝেমধ্যে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমিও ওঁকে সঙ্গ দিতে ড্রিংক করতে শুরু করলাম।

জানলার বাইরে তাকালাম। বাইরে তখন পরিচয়হীন অন্ধকার। শুধু জঙ্গলের ছায়াশরীর দেখা যাচ্ছে। তার ফাঁক দিয়ে নখের মতো সরু একটা চাঁদ চারদিকের অন্ধকারে যেন আঁচড় বসাতে চাইছে। সামনের বিশাল ওক গাছটা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের লন জুড়ে শুধুই গভীর অন্ধকার, যেন তাতে চাঁদের আলোর পা বাড়ানোরও অনুমতি নেই।

জঙ্গলের ভিতরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে এই রাত কাটানোর অনুভূতির মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব আছে। আমরা বাইরের কিছু দেখতে না পেলেও বাইরে থেকে আমাদের নিশ্চয়ই এই মোমবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে। শুধু এই অদ্ভুত নির্জন পরিবেশ অনুভব করার জন্যই কি উনি আমাকে এখানে এতদূর টেনে এনেছেন? নাকি কিছুর অপেক্ষায় আছেন!

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা গম্ভীর স্বরে কয়েকবার সশব্দ হয়ে উঠে জানাল যে রাত দশটা বেজে গেছে। ভদ্রলোক কী আমাকে এভাবে সারারাত বসিয়ে রাখবেন?

বলে উঠলাম-আচ্ছা, আপনি যে বললেন এ বাড়িতে একরাত থাকলে আমার সত্যি ভয়ের অনুভূতি হবে! সেরকম কিছু কি এখানে হয় নিয়মিত?

পরিষ্কার কোন উত্তর দিলেন না। বলে উঠলেন।-তুমি কি এখন শুতে যাবে ভাবছ?

আবার মুখে সেই রহস্যজনক হাসি।

—না, মানে আপনি কখন শুতে যান?

—যাই না। গত কয়েক বছরে আমার অভ্যেস বদলে গেছে। এখন রাতে ঘুমোই না। এখানেই বসে থাকি। ভোরের দিকে কখনো-সখনো ঘুমিয়ে পড়ি।

—কেন?

—ওই যে আগেই বললাম না, রাতের বেলা এখানে বেশ জমজমাট! ঘুম বারবার ভেঙে যায়। একটা অদ্ভুত অন্যরকম অস্বস্তি হয়। মনে হয় যেন আমার শেষসময় এসে গেছে। অদ্য শেষ রজনী। তুমিও ঘুমের প্ল্যান করো না। ঝড়ের রাতে মাঝসমুদ্রে সেলিং বোটে কেউ ঘুমোয় না! যেকোনও সময় বিপদ এসে হানা দিতে পারে।

একটু থেমে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—দাঁড়াও, তুমি ভাবছ বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। তোমাকে কিছু জিনিস দেখাই। তুমি বুঝবে। আমার সঙ্গে এসো।

হাতে একটা শেজবাতি ধরে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে ফের ওঁর লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। বিশাল বড় ঘর। কাঠের দেওয়ালে নানান ধরনের কাজ। আগেও দেখেছি। ঘরের একটা কোণে নিয়ে এসে আলোটা

তুলে ধরলেন। বললেন—কাঠের উপরে করা এ নকশাটা দেখেছ?

দেখেই বোঝা যায় সামনের কাঠের কাজ খুব পুরনো। কিন্তু এ নকশা ভারী অদ্ভুত। যেন একটা বড় হাঁ করা মুখ। তার দুটো বড় বড় দাঁত। একটা লম্বা জিভ তার থেকে বেরিয়ে আছে। তার উপরে তারার মতো একটা পেন্টাগ্রাম আঁকা।

বীরেনবাবু বলে উঠলেন—ছবিটা হল শয়তানের। সে যেন এখানে বেরোতে না পারে, তাই তার উপরে এরকম তারা আঁকা। এই ঘরটা খুব পুরনো। এ কাঠের দেওয়াল কয়েকশো বছরের। বুঝতেই পারছ, আমি কোনও পরিবর্তন করিনি। এরকম আরও অনেক ছবি, অনেক জিনিস ছড়িয়ে আছে এ বাড়িতে। যেরকম ছিল, সেরকমই আছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয় শুধু শুধু এখানে আছে এগুলো?

পড়ার ঘর থেকে বেরোনোর পরে প্যাসেজের একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। শেজবাতিটা আমার হাতে দিয়ে উনি নিচু হয়ে কাঠের মেঝের একটা অংশের কাঠ টেনে পাল্লার মতো খুলে ফেললেন।

তারপরে বলে উঠলেন—আলো ফেলো, এই কাঠের নীচের দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছো?

আমি বসে পড়ে খুব খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করলাম। বলে উঠলাম

—হ্যাঁ, যেন কারোর নখ দিয়ে বা খুব ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ।

উনি কাঠের পাল্লাটা ফের নামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—এটাকে বলা হয় উইচ মার্ক। আসলে বলা উচিত অ্যান্টি উইচ মার্ক। যাতে ডাইনী না জেগে ওঠে এ বাড়িতে। বছরের পর বছর, শতকের পর শতক যেন এ বাড়িকে ডাইনি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

—ডাইনি, এ বাড়িতে?

—হ্যাঁ, সেটাই বলছি। আমি এ বাড়ি কেনার পরে এসব সিম্বল, অ্যান্টি উইচ মার্ক দেখে খুব অবাক হই। যত দিন যায়, তত বেশি এরকম নানান ছবি খুঁজে পাই। একটাই উদ্দেশ্য যেন যেকোনও উপায়ে কোন এক ডাইনিকে এ বাড়ির থেকে দূরে রাখা খুব জরুরি। পরে আসল গল্পটা জানতে পারি। চলো, টী রুমে গিয়ে তোমাকে সে গল্প বলছি।

৬
এমার কথা

আবার আমরা ওই টী রুমে ফিরে আসলাম। বীরেন বাবু ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলে ওঠেন—তোমাকে একটু সেই সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। গল্পের টাইম মেশিনে করে। তা না হলে এ ঘটনাটা ঠিক বুঝতে পারবে না।

তখন কিন্তু ইংল্যান্ড মানে কুসংস্কার, চার্চের আধিপত্য, মানুষে মানুষ হিংসা। খারাপ কোন কিছু ঘটলে বা কোনো কিছু বুঝতে না পারলেই তার পিছনে ডেভিল বা শয়তান আর ডাইনীকে খুঁজে বার করা। এটা সেই সময়ের কথা। ১৩৪০ সাল। এমনিতেও সেই একশো বছর ইংল্যান্ডের জন্য খুব খারাপ ছিল। আসলে রোমান সময় থেকে এই সময় অব্দি চাষবাসের পদ্ধতিতে কোনওরকম উন্নতি হয়নি। একইরকম অনুন্নত ছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা সেখানে বেড়ে গিয়েছিল অনেকগুন।

এজন্য ১৩১৭-১৮ সালে দুবছর ধরে বড় খরা দেখা যায়। একইসঙ্গে অনেক গৃহপালিত পশু কোনও এক অজানা অসুখে মারা যায়। খাবারের বড় সঙ্কট ছিল এই সময়।

এ বাড়িতে থাকত ক্লার্ক পরিবার। সুখী উচ্চবিত্তপরিবার। স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে ওএক মেয়ে। সঙ্গে পিটারের বৃদ্ধা মা। বাড়িতে বেশ কিছু কাজের লোক। পিটার খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। ল্যাটিন জানতেন। এজন্য চার্চ ও অ্যাবের স্থানীয় লোকেরাও ওঁর সাহায্য নিতে মাঝে মধ্যে আসত। অনেকটা জমি ছিল পিটারের। সেখানে চাষীদের দিয়ে চাষবাস করাতো। অনেক গরু ভেড়া ছিল। ভেড়ার উল দিয়ে পোশাক তৈরি করে ইউরোপে পাঠাত। সে ব্যবসা আস্তে আস্তে বেশ বড় হয়ে ওঠে।

পিটার ছিল খুব বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। কিছু একটা বিষয় নিয়ে পিটারের সঙ্গে এখানকার চার্চের বিরোধ বাধে।

—চার্চ তো সে সময় খুব শক্তিশালী। শুনেছি রাজার দরবারেও চার্চের নেতারা উপস্থিত থাকত।

—ঠিক বলেছ। এমন কেউ ছিল না যে চার্চে রোববারে প্রার্থনা করতে যেত না। তখন অসুখ-বিসুখ লেগে থাকত। সবার ধারণা ছিল যীশুর অর্থাৎ চার্চের উপদেশ না মানলে নরকে তার স্থান হবে। শুধু সাধারণের মনের উপরেই যে চার্চের এই একচ্ছত্র অধিকার ছিল তাই নয়, চার্চ ও মনাস্ট্রি বই প্রকাশ করত, স্কুল-হাসপাতাল চালাত। বলতে পারো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। অনেকটা আজকের রাজনীতির মতো।

—এখানে মনাস্ট্রি ছিল নাকি?

—এখান থেকে মাইল খানেক দূরে ছিল। সেখানেও সবাই পিটারকে চিনত ওঁর পাণ্ডিত্যের জন্য। তা যা বলছিলাম। আমার মনে হয় পিটার ক্লার্ক বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করায় চার্চের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিলেন। সেখান থেকেই শুরু। চার্চ ও ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী বেশ কিছু লোক পিটারের উপরে ভারী ক্ষেপে যায়। নেহাত পিটার অর্থবান ছিল, এখানকার অনেকে তাকে খুব ভালোবাসত। তাই সরাসরি কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

সে সুযোগ এল। ১৩৪৮ সাল। এই ওয়াইন থেকেই।—বলে ওয়াইন গ্লাস টা তুলে ধরে বীরেনবাবু ফের বলে উঠলেন। ১৩৪৮ সালের জুন মাস নাগাদ ইংল্যান্ডের ডরসেটে প্লেগ শুরু হয়। ফ্রান্সের বোরদো থেকে একটা জাহাজ এসেছিল। সেই জাহাজে শুধু ওয়াইন ছিল না, ছিল প্লেগ জীবানুবাহী ইঁদুর। তার থেকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইংল্যান্ডে। এখানে আগস্টে শুরু হয়। কেউ এরকম অসুখ আগে দেখেনি। কি করতে হবে তাও জানত না। হঠাৎ করে মৃত্যুর অভিযান শুরু হল। সকালে সুস্থ লোক রাতে মারা যাচ্ছে।

সবার ধারণা হয়েছিল কোনও কারণে ভগবান ক্ষেপে গেছেন। হয়তো এর মধ্যে কোনও শয়তান বা ডাইনীর কারসাজি আছে। কোন মানুষের পাপের ফল। চার্চ পিটারের নাম সবার সামনে এনে দিল। বলে দিল পিটার আর পিটারের পরিবারের জন্যই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে পুরো তল্লাটে। যদি বাঁচতে হয়, সে পরিবারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ডাইনীকে মারতে হবে।

গ্রামবাসীদের জানা ছিল না যে এ সমস্যা শুধু এখানকার নয়। ১৩৪৭-এর অক্টোবরে সিসিলি থেকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে এ মারাত্মক অসুখ। যার কোনও চিকিৎসা নেই। শয়ে শয়ে মানুষ মরছিল শুধু এখানে নয়, পুরো ইউরোপে। অসুস্থ ইঁদুর থেকে অসুস্থ ফ্লী বা নীলমাছির মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছিল মানুষে। তখন সব বাড়িতেই অজস্র ইঁদুর থাকত। এত পরিচ্ছন্নতা ছিল না। তাই এই সংক্রমণ খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু এই অসুখের পিছনে যে এসব কারণ আছে, তা বোঝার ক্ষমতা কারুর ছিল না। সে সময়ে সেরকমভাবে কোনও ডাক্তার বা চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। যারা ছিল সব হাতুড়ে ডাক্তার। কেউ কেউ শরীরের কিছু জায়গা কেটে খারাপ রক্ত বার করে দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করত। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হত না।

যার সংক্রমণ হত, তার বগলে, কুচকিতে বা ঘাড়ে চামড়া খানিকটা ডিমের মতো ফুলে উঠত। সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা ও বমি। ডায়েরিয়া। খুব জ্বর হত। সঙ্গে ক্লান্তি। নাক মুখ দিয়ে রক্তবমি। তারপরে সারা গায়ে ব্যথা, একটানা কাশি। তিন দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু।

শুধু তাই নয়, যারা তার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সবারই এক দশা হত।

আগেই বলেছি, তখনকার সময়ে যা বোঝা যেত না, তার পিছনেই কোনও ডাইনী খুঁজে বার করা হত। এক্ষেত্রেও তাই হল।

সব আঙুল উঠল এ পরিবারের দিকে। নির্ঘাত এর পিছনে ক্লার্ক পরিবারের হাত আছে। চার্চ সে কথা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

—তারপর?

—সে সময় চার্চ সত্যি খুব ক্ষমতাশালী ছিল। যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতো, তার পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো খুব শক্ত ছিল। সে যতই অর্থবানই হোক না কেন। ক্লার্ক পরিবারের একই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হল। প্রায় সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একই সঙ্গে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে এই মহামারীর পিছনে পিটার ক্লার্ক এর পরিবারের কারুর হাত আছে। সেটাও চার্চ বলে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল যে এর পিছনে আছে পিটারের পনেরো বছরের মেয়ে এমা। এমা হচ্ছে আসলে ডাইনী।

মনের অন্ধকার যখন ছড়িয়ে পড়ে, এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। একজন থেকে আরেকজনে। প্লেগ শুধু মানুষকে শারীরিক দিয়ে অসুস্থ করেনি, করেছিল মানসিক দিক দিয়েও।

সে সময় কিছু নিয়ম কানুন ছিল। তা হল কাউকে ডাইনী সন্দেহ হলে, তাকে সে যে ডাইনী নয়, তা প্রমাণ করতে হবে।

—কিন্তু এমা তো বাচ্চা মেয়ে। হঠাৎ করে ওর উপরে সবার সন্দেহ হল কেন?

—ভালো প্রশ্ন—বীরেন বাবু চশমা খুলে ক্লান্ত চোখের পাতার উপরে আঙুল বুলিয়ে ফের বলে উঠলেন—খুব দুর্ভাগ্যজনক। একটা নিরীহ বাচ্চা মেয়ে। একটাই দুর্বলতা ছিল ওর। তোতলাতো। সে জন্য কিনা জানি না ও সে লজ্জায় চার্চে যেতে চাইত না। এ ছাড়া চার্চের ওর উপরে রেগে যাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল। ও একটা ছেলেকে ভালোবাসত। সে ছিল ভিনদেশী, অন্য সম্প্রদায়ের। পিটারের ব্যবসার সঙ্গে সে ছেলেটা যুক্ত ছিল। সে প্রেমে চার্চের অনুমতি ছিল না।

সে সময়ে একটা ধারণা ছিল যে ডাইনীরা বাইবেল পড়তে পারে না। বিশেষ করে 'লরডস প্রেয়ার' এর অংশটা। এমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে। তোতলা হওয়ায় ও সে টেস্ট ফেল করে। অবশ্য পরীক্ষা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে ও ফেল করে। বুঝতেই পারছ তার ফল কি হয়।

আরেকটা টেস্ট করা হয় ওর উপরে। ও জলে ডুবে যায় কিনা। হাত পা বেঁধে এখান থেকে কিছু দূরে একটা নদীর জলে ওকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। একটা ধারণা ছিল যে ডাইনীরা জলে ডোবে না। কীভাবে জানি এমা জলে ডোবেনি। ভেসে ছিল বেশ খানিকক্ষণ। ওই সময়ের একটা বইতে সে খবরটা পেয়েছি। এটা ছিল

ডাইনী প্রমাণ করার মূল টেস্ট। তাতেও ফেল করার পরে আর কোনও প্রশ্নের অবকাশ ছিল না যে ওই মেয়েটা ডাইনী। সবার ধারণা হয় যে ওর জন্যই এখানে এরকম মারণ রোগ দেখা দিয়েছিল।

—তা ক্লার্ক ফ্যামিলি সেক্ষেত্রে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে পারত। এখানে পড়েছিল কেন?

—হ্যাঁ, তা পারত। তবে সে সময় খারাপ খবর ঠিকই পৌঁছে যেত আশেপাশের গ্রামে। ওরা যেখানেই যেত লোকে একই রকমভাবে সন্দেহ করত এমাকে। তা ছাড়া মনে রেখো তখন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। এত সহজে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় একটা বড় পরিবারের পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ব্যবসা শুরু করাও সহজ হত না।

—তারমানে এখানেই থেকে গিয়েছিল ক্লার্ক পরিবার। কিন্তু তারপরে কী হয়েছিল?

বীরেনবাবু খুব গম্ভীরভাবে ওয়াইনে আরেকটা হালকা চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন—এসব কিন্তু আমি সেসব বই পড়েই জেনেছি, যা চার্চের লোকেদের লেখা। সেখানে বলা হয়েছে ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

—মানে? ওই টুকু বাচ্চা মেয়েকে?

—হ্যাঁ, সে তো জোয়ান অফ আরক-কেও মারা হয়েছিল এর আরও প্রায় আশি বছর পরে ডাইনী অপবাদে। এরকম আরও অনেক ঘটনা খুঁজে পাবে। আসলে ডাইনী সাব্যস্ত করা ছিল বেশ সহজ কাজ।

—কিন্তু পিটার মেয়েকে বাঁচাতে পারেনি?

—বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ক্লার্ক পরিবার। কিন্তু পুরো গ্রাম ক্ষেপে উঠলে আর কী করবে? বিশেষ করে যদি চার্চের নেতারাই, ফাদাররাই তাদের নেতৃত্ব দেয়। একরাতে এ বাড়ি পুরো ঘিরে ফেলে গ্রামের লোক। তার পুরোভাগে ছিলেন ফাদার ফারডিন্যান্ড। পড়েছি মেয়েটা লুকিয়ে ছিল এই ঘরে ওই আলমারির মধ্যে। ওই যে সামনের আলমারির মধ্যে।

ঘরের কোণে রাখা আলমারির দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন বীরেনবাবু। তারপরে ফের বলতে শুরু করেন—সেই রাতে দরজা ভেঙে লোকজন ঢুকে আসে। ওর বাবার ব্যবসায় যুক্ত ছিল যে ছেলেটা, যে নাকি এমাকে ভালোবাসত, সে এমাকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। ওদেরকে গ্রামের লোকেরা ধরে ফেলে। তারপরে আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

—ছি। ছি। কী বলব জানি না। এখন এরকম একটা অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে বসে আছি। সব শুনে মনটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল।-একটু থেমে আবার বলে উঠি—তা আপনি এত কিছু জানলেন কিভাবে?

—অনেক ইতিহাসের বইতে এই ঘটনা লেখা আছে। কিছুটা আমি রিসার্চ করে জেনেছি যে ঠিক কি হয়েছিল। সে জন্য এ বাড়িটার উপরে একটা মায়া পড়ে গেছে। মেয়েটার উপরেও।

—তা তারপরেও এতো বছর ধরে এখানে এরকম ডাইনী তাড়ানোর ব্যবস্থা কেন? মেয়েটাকে তো পুড়িয়ে মারা হয়ে গিয়েছিল।

—আসলে আমার আগে যারা ছিল, তারা নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থাগুলো নিয়েছিল এ বাড়ির দুর্নামের কথা শুনে। ১৬০০ সালের পর থেকে রাজা প্রথম জেমস এমনিতেও ডাইনী তাড়ানোর এসব ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে দেয়। তারপরেও এ বাড়িতে এরকম অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখা ছিল। এই উইচ বটলটাও খুব যত্নে ফায়ার প্লেসের সামনে কাঠের নিচে লুকোনো ছিল। আমি খুঁজে পাই।

—আপনিও কি এসবে বিশ্বাস করেন? এগুলো রেখে দিয়েছেন কেন?

—না, পুরোপুরি যে বিশ্বাস করি তা নয়। তবে কোনওরকম গণ্ডগোল শুরু হোক, সেটা অবশ্যই চাই নি। মনের মধ্যে হয়তো একটা ভয় ছিল। রিস্ক নিইনি। যেখানে যেরকম আছে, সেরকমই থাক।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সে মেয়েটাকে পোড়ানোর দৃশ্যকে। কীরকম যেন বিষাক্ত মনে হচ্ছিল এ ঘরের বাতাস।

এগিয়ে গিয়ে কাঠের উইচ বটল-টা হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠলাম—এরকম একটা ঘটনা শোনার পরে আমার মনে হচ্ছে এসব জিনিস ঘরে রাখা যেন একরকম এই অন্যায়কে মেনে নেওয়া। সেটাকে সমর্থন করা। একটা বাচ্চা মেয়েকে ডাইনী সন্দেহে মারা হয়েছিল। আগুনে পুড়িয়ে। সে অপরাধ যে আমরা আজও মেনে নিয়েছি, তার প্রমাণ এটাই। একই রকম ভুল করে চলেছি।

কথাটা বলতে বলতে উঠে গিয়ে বোতলটা তুলে নিয়ে ভেতরের তরলটা কিছু দূরে বেসিনে ঢেলে দিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল কাঠের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিই।

বীরনবাবু প্রথমে ব্যাপারটা বোধহয় বোঝেননি। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন—এ-এ কী করলে? —বলে উঠে এসে আমার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নিলেন। দেখলাম উনি যেন ভয়ে কাঁপছেন। মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বেসিনের মধ্যে মোমবাতির আলো উঁচু করে ধরলেন।

না, সে তরল আর বোতলে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। আমিও বুঝলাম উত্তেজিত হয়ে এটা করা একেবারে উচিত হয়নি। ক্ষণিকের উত্তেজনায় করে ফেলেছি। অন্য একজনের বাড়িতে বেড়াতে এসে আমার এটা করা উচিত হয়নি।

বীরেনবাবু দেখি স্থানুর মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকবাদে যেন আবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

উনি বেসিনে পড়ে থাকা কয়েকটা পেরেক জাতীয় জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে উইচ বটলটার ভেতরে ফেলে কাঁপা হাতে টেবিলের উপরে বটলটা রাখলেন। তারপরে সোফায় গিয়ে বসলেন। মাথায় হাত দিয়ে মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ কথা বললেন না।

তারপর মৃদু স্বরে বলে উঠলেন—খুব বড় ভুল করলে। এটা ঠিক করো নি।

আমি লজ্জিত হয়ে বসেছিলাম। চুপ করে।

বাইরে ইতিমধ্যে ঝড় শুরু হয়েছিল। অন্ধকারে গাছের অবয়ব শুধু দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন একদল দানব ঘিরে ধরেছে বাড়িটা। কাছে-আরও কাছে তারা এগিয়ে আসছে।

ঝড়ের তীব্রতা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। এক রুগ্ন চাঁদের আলোয় জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল যে দূরে গাছেরা যেন প্রবল ভাবে মাথা দোলাচ্ছে। একটা আরেকটা উপরে গিয়ে পড়ছে মাতালের মতো। একটা সোঁ-সোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। নেহাত মোটা ডাবল গ্লেজ কাচ, তাই শব্দ সেভাবে জোরে শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু শিরশির করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিল ঘরে। ভিজে সে বাতাস। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বললেও সেই আগুন যেন এই ঠান্ডা বাতাসকে আর সামলাতে পারছিল না।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে এই অস্বস্তিকর নীরবতাকে কাটানোর জন্যেই আমি বলে উঠলাম—ওই বোতলে কি তরল ছিল, জানেন?

—ইউরিন। মন্ত্রপুত পেচ্ছাপ। সাড়ে ছ'শো বছর পুরনো। টেস্ট করে দেখেছিলাম। এরকমই করা হত। যাতে ডাইনী না আসতে পারে। সেই ডাইনী যদি এখন এখানে ফিরে আসতে চায়, তাকে আটকানো যাবে না।

বীরেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—এ আপনি কী বলছেন? কে ফিরে আসবে? এমা? কেন?

—দেখো কী হয়। এখানে যা যা কাণ্ড হয় হঠাৎ করে। হয়তো এটা আমদের রক্ষা করত। এখন আর করবে না।

—কিন্তু এমা তো ডাইনী ছিল না। কেউ তো ডাইনী হতে পারে না!

—দেখো মানুষের বিশ্বাস একজন নিরীহ মানুষকে দেবতাও করে তুলতে পারে, ডাইনীও করে তুলতে পারে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ভদ্রলোক খুব শকড। জানি ভদ্রলোক সম্পূর্ণ আজগুবি কথা বলছেন। কিন্তু সে যাইহোক, আমি নিজে যেভাবে ঝোঁকের বশে করে ফেলেছি, সেটা ভেবে নিজেরই খারাপ লাগছে। হাজার হোক এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল। পুরনো দিনের উইচ ক্রাফট এভাবে সংরক্ষিত আর ক'টা জায়গায় আছে?

দেখলাম বীরেন বাবু সোফার হেলান দিয়ে বসেছেন। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। চোখদুটো বন্ধ করে মাথা পিছন দিকে একটু হেলিয়ে বসেছেন। সামনে কাচের সুদৃশ্য মোমদানিতে রাখা মোমবাতির আলো যেন ভয়ে কাঁপছে। বাইরে ঝড়ের জন্যই ভেতরে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। তাতেই কাঁপছে মনে হয়। তার জন্য দেওয়ালে যেন অনেকগুলো ছায়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চারদিক এতটাই নিস্তব্ধ যে নিজের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি।

দূরে টেবিলের উপরে একটা মোটা চামড়ায় বাঁধানো বই ছিল। দেখেই বোঝা যায় বেশ পুরনো। হয়তো আমাকে দেখাবেন বলেই রেখেছেন। বীরেনবাবুকে বিরক্ত না করে, বইটা নিয়ে এসে পড়তে শুরু করলাম। ইংরেজি হরফ। কিন্তু কিছুই যেন পড়ে বুঝতে পারলাম না।

—কীসের বই এটা?

জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলাম না। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছেন বীরেনবাবু।

পাতা ওলটালাম। বিশাল ভারী বই। কিছু ছবি আছে। প্রত্যেক পাতার বেশ কিছু অক্ষর সোনার জলে লেখা। এসব বই এককথায় অমূল্য।

আমাকে যে উনি এভাবে এখানে ডেকে এনে এসব দেখাচ্ছেন, এর জন্য ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতে হবে। বই এর কিছু ছবি বেশ ভয়ানক। বুঝতে পারলাম এটাও ডাইনী-উইচক্রাফট এসবের উপরে।

পড়তে গিয়ে দেখলাম আর পড়া যাচ্ছে না। মোমবাতির আলো যেন আরও বেশি করে কাঁপছে। মনে হল একই সঙ্গে ঘরের উষ্ণতা যেন বেশ কমে গেছে। গায়ে একটা জ্যাকেট থাকলেও রীতমতো কাঁপছি।

এর মধ্যে ঘরের ভিতরে একটা অস্বস্তিকর খসখস আওয়াজ শুরু হল। ঘরের মধ্যে মথ জাতীয় কোনও কিছু ঢুকেছে হয়তো। বীরেনবাবু দিব্যি সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। আমি নিজে উঠে কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে দেখতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, সেরকম দৃশ্য আগে কোনওদিন দেখিনি। ঘরের কোনে যে কাঠের আলমারি আছে, তার সামনে প্রায় হাজার খানেক লার্ভা। ওই দিকে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তার আলোয় দেখলাম সাদা সাদা হাফ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের অজস্র লার্ভা ঘরের ওই দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সম্ভবত মাছির লার্ভা। কিন্তু হঠাৎ করে উদয় হল কি করে? এরকম হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও তো ছিল না!

নাহ, বীরেনবাবুকে ডাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

এবারে গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিলাম। ভদ্রলোক দেখি হঠাৎ চমকে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। আমি ওঁকে দেখালাম ঘরে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মাছির লার্ভা। উনিও দেখে বেশ অবাক। এগুলো সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লে সাত-আট দিন বাদে এ বাড়িতে মাছির উৎপাতে থাকা মুস্কিল হয়ে যাবে।

আমি অবশ্য ওঁকে হাত দিতে দিলাম না। ড্রয়িং রুম থেকে ঘর পরিষ্কারের একটা জিনিস নিয়ে সব লার্ভা পাশের টয়লেটে গিয়ে ফেললাম। কিন্তু সেটা করতেই প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল।

বীরেনবাবুও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করছিলেন। আলো ধরেছিলেন।

এবারে আবার সোফায় বসে বলে উঠলেন—নাহ, আমিও কিন্তু এরকম আগে দেখি নি। কোথা থেকে এগুলো এল কে জানে? এসব কিসের লক্ষণ? যেন কিছুর অশুভ সংকেত।

একটু লজ্জিত হয়ে ফের বলে উঠলেন—আসলে তুমি আছো বলেই হয়তো খানিকটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—আচ্ছা, এমাকে মেরে ফেলার পরে এ পরিবারের লোকেরা কী করেছিল? এখানে ছিল?

—হ্যাঁ, ওরা এখানেই ছিল। তবে এখানে এতো মৃত্যু হয়েছিল যে ১৩৫১ সালে নাগাদ এ গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। সংক্রমণের ভয়ে অনেকে মৃতদেহ গ্রামের রাস্তায় ফেলে চলে যেত। অনেকের মৃতদেহ মাসগ্রেভে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। শুনেছিলাম এখানে যে মঠ ছিল, সেই মঠেও এমন মড়ক লেগেছিল যে প্রায় সব মঙ্ক বা সন্ন্যাসী মারা যায়।

সামান্য কিছু পরিবার পড়েছিল। পরে তারাও এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

শুধু এই গ্রাম নয়, পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে জনসংখ্যা এতো কমে গিয়েছিল যে শ্রমিক আর পাওয়া যাচ্ছিল না। শ্রমিকদের বেতনও এজন্য বেড়ে যায়। বলতে পারো ইংল্যান্ডে বড় কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে এই ব্ল্যাক ডেথ।

—কীরকম?

—শ্রমিক সংখ্যা খুব কমে যাওয়ায় চাষবাসের জন্য লোক আর পাওয়া যাচ্ছিল না। উপায়? মনে রাখবে প্রত্যেকটা বিপর্যয় নতুন সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে। সবাই তখন ভেড়া পুষতে শুরু করল। ঘাসজমিতে অনেক ভেড়া রাখলে আর লাঙল চালানোর বা চাষবাস করার দরকার পড়ে না। এভাবে ঘাসজমির ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। একই সঙ্গে ভেড়ার পশম থেকে উলের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। উল, উলের তৈরি পোশাক ইংল্যান্ডের প্রধান পণ্য হয়ে ওঠে, যা এখান থেকে উত্তর ইউরোপ আর স্পেনে রপ্তানী হতে শুরু করে।

বুঝলে, একটার সঙ্গে আরেকটা ঘটনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এর জন্য ইংল্যান্ডের বন্দরগুলো খুব তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে। দেশবিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

—বাহ। ব্ল্যাকডেথের অনেক ভালো দিক ছিল তো!

—একদম। কুসংস্কারে ঢাকা সমাজে অনেক ভালো পরিবর্তন এনেছিল ব্ল্যাকডেথ। ব্ল্যাকডেথের আগে এখানে জমিদারী প্রথা ছিল। সে সব জমিদারী প্রথাও উঠে যায় ব্যাক ডেথের পরে। চাষীরা আর জমিদারের হয়ে তাদের জমিতে চাষবাস করতে আগ্রহী ছিল না। তারা তার থেকে অনেক বেশি রোজগার করতে পারত নিজেদের জমিতে। এজন্য সব তৈরি করা জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। নুন থেকে লোহা, সব কিছু। অন্যদিকে, গরু, ভেড়া, ষাড়—এসবের দাম একেবারে কমে যায়।

জমিদারদের এজন্য সমস্যা হয়। এক তো কাজের লোকেদের অভাব, তারপরে যারা কাজ করত তাদের দিন-মজুরিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে এসব ফার্মে যে সব জিনিস তৈরি করা যেত, সেসবের দাম ও চাহিদাও কমে এসেছিল। এর জন্য জমিদাররা নিজেদের অধিকারে যে জমি রাখত, তার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ভাড়া দিয়ে দেয় অন্যদের।

—নিশ্চয়ই চার্চের উপরেও লোকেদের আস্থা কমে গিয়েছিল? এতো মৃত্যু! তাদের মধ্যে আবার চার্চের পাদ্রীদের মৃত্যুর সংখ্যাও নিশ্চয়ই অনেক ছিল। তাহলে তারা আর কী করে ক্ষমতাশালী ও ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হতে পারেন? নিজেদের বাঁচাতে পারছেন না, অন্যদের বাঁচাবেন কি করে?

—ঠিক বলেছ। এর জন্য সাধারণ লোকের চার্চের উপরে বিশ্বাস কমে আসে। অনেক পাদ্রী মারা যায়। চার্চের সংখ্যাও কমে আসে। ফ্রিডেল কি বলেছিল জানো? বলেছিল আধুনিক মানুষ এর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল ব্ল্যাক ডেথের পর থেকে। কথাটা একদম ঠিক।

—আচ্ছা, আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি তখন বললেন না, বাড়ির বাইরে যে লাল ক্রশটা দেখলাম, ওটা কি?

—লাল ক্রশ? কোথায় দেখলে?—একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বীরেনবাবু।

—ওই যে বাড়ির বাইরের দরজার পাশের দেওয়ালে।—বলে টেবিলের উপরে আঙুল দিয়ে ক্রশ এঁকে দেখালাম।

—আশ্চর্য। আমার চোখে তো পড়েনি! এরকম কিছু দেখিনি তো কোনওদিন। ভুল দেখেছ। তবে জানো কিনা জানি না মধ্যযুগে কোন বাড়িতে প্লেগ হলে, তার দেওয়ালে লাল ক্রশ দাগ দেওয়া হত। চিহ্নিত করার জন্য এরকম সিম্বল ব্যবহার করা হত। তবে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমার চোখের ভুল।

হয়তো তাই হবে। কথা বাড়ালাম না।

আরও কিছুক্ষণ কথা হল। এরমধ্যেই ঘড়ি সংক্ষিপ্তভাবে সবথেকে কম সময় নষ্ট করে একটার ঘণ্টা বাজাল। বেশ ঘুম পেয়ে গেছে। এবার শুয়ে পড়ি। এখানে কিছুই করার নেই। না টিভি, না ফোন, না ইন্টারনেট। বীরেনবাবু যে কী করে সময় কাটান কে জানে!

আমার উসখুস ভাব দেখে উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন—ঠিক আছে। তোমাকে আর আটকাবো না। তুমি শুতে চলে যাও। আমি এখানেই বসব। গুড নাইট।

আমিও আর ভদ্রতা না দেখিয়ে উঠে পড়লাম। সারাদিন যা গেছে।

৭

বাড়ির বাইরে ওরা কারা?

আমি আমার ঘরে শুতে গেলাম। এতো ক্লান্ত ছিলাম যে শুতে না শুতেই ঘুম এসে গেল।

ঘুমের মধ্যে দেখলাম কারা যেন আমার পিছু নিয়েছে। একটা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে আমি ছুটে যাচ্ছি কার যেন হাত ধরে। কিন্তু চারদিক থেকে অনেক লোক আমাদের ঘিরে ধরছে। মনে হচ্ছে আমি যেন কিছু একটা চুরি করে পালাচ্ছি। যত জোরেই ছুটি না কেন, ওরা আমদের ধরে ফেলছে। একটা সময় ধরে ফেলল। যার হাত ধরে ছিলাম, সে কোথায় গেল? তাকে আর খুঁজে পেলাম না। লোকগুলো আমাকে ধরে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। গায়ে কী একটা তরল ছিটিয়ে আমার গায়ে মশাল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল।

সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। ছটফট করছি, অথচ হাত পা বাঁধা থাকার জন্য কিছুই করার উপায় নেই। কোনরকমে সে আগুন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।

ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বুক ধড়ফড় করছে। খাটের উপরে উঠে বসেছি। এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘামছি। এটা যে স্বপ্ন, সত্যি নয়, কোথায় আছি সেটা বুঝে উঠতে, এককথায় বলতে গেলে নিজেকে ফিরে পেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

স্বপ্ন বাস্তবের এত কাছাকাছি চলে আসতে পারে! মনে হচ্ছিল তখনও যেন সারা গায়ে আগুন জ্বলছে।

ঘরে যেন বাইরে থেকে খুব ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে দরজার দিকে তাকালাম। ঘরের দরজাটা আধখোলা। ওটা তো বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। যাক গে। দরজা খোলা থাকলেই বা কি! কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ফের শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ঘুম আর এলো না। মনে হল ধীরপায়ে সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছে। হাল্কা পায়ের শব্দ। সে শব্দ যেন কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। হয়তো বীরেনবাবু উঠে আসছেন। কিন্তু খেয়াল করতে মনে হল, এটা বীরেনবাবুর হতে পারে না। এটা বাচ্চা কারো পায়ের শব্দ। হাল্কা শব্দ। উপরে উঠে আমার ঘরের দরজার সামনে থেমে থাকল খানিকক্ষণ।

একটা অজানা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

তারপর কী জানি মনে হল! কম্বল ফেলে উঠে বসলাম। ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তবে তার উপর ভরসা না করে আমার পাশে ফোনটা হাতে নিয়ে নিলাম। ফোনে টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের বাইরে ফেললাম। সিঁড়িতে। প্যাসেজে। কেউ কোথাও নেই।

পাশাপাশি চারটে ঘর। তাহলে কি অন্য কোনও ঘর থেকে আওয়াজটা এসেছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছু না দেখতে পেয়ে অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে এক এক করে দেখলাম। কেউ নেই।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বীরেনবাবু ঠিক বলেছেন, এ বাড়িতে এমন কিছু আছে যে ঘুম আসে না। কিন্তু বীরেনবাবু কি এখনও নীচেই?

নীচে নেমে এলাম। দেখি বীরেন বাবু সোফায় বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। ফায়ারপ্লেস-এ আগুন জ্বলছে।

কি মনে হল উপরে না গিয়ে নীচে ওঁর পাশের সোফায় বসে বইটা ফের দেখতে শুরু করলাম। বাইরে গভীর অন্ধকার। বাড়ির ভেতর ফের নিস্তব্ধ। ভালো করে শুনলাম কোনও শব্দ নেই। কিন্তু কীরকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে লক্ষ্য করছে। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করলাম মোমবাতির আলো একই ভাবে তিরতির করে কাঁপছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় দেওয়ালে-মেঝেতে কিসের যেন ছায়া কাঁপছে।

হঠাৎ মনে হল বাইরের প্যাসেজে আবার যেন সেই পায়ের শব্দ। কানখাড়া করে খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। তারপরে একটা মোমবাতি নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখি, আবার সেই। কেউ কোথাও নেই। আবার সব চুপ। ফিরে এলাম।

এখন বুঝতে পারছি, আজ এতোদিন বাদে বীরেনবাবু কেন এত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন। আজ আমি এখানে আছি। কিন্তু আমার পক্ষে ঘুম আর জোর করে ডেকে আনা অসম্ভব।

মনটাকে অন্যদিকে করার জন্যই সোফায় বসেই ইংল্যান্ডের ইতিহাসের উপরে একটা বই পড়তে শুরু করলাম। ইতিহাসে আমার সামান্য আগ্রহ আছে। কিন্তু এরকম গুরুগম্ভীর ইতিহাসের বই হাতে নিয়ে পড়লে ইতিহাসের প্রফেসাররাও ঘুমিয়ে পড়বেন। আমারও তাই হল।

পড়তে পড়তে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আচমকা যেন প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে চমকে উঠে বসলাম। কারা যেন ঘরের কাচের জানলায় ধাক্কা মারছে। একই রকম আওয়াজ মূল দরজার উপরে। বেশ জোরে জোরে ধাক্কা।

জানলার দিকে তাকাতে ভয়ে হার্টবিট কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। বাইরে বাগান আর অন্ধকার নেই। যেন অনেক মশালের আলো এ বাড়িকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। কিছু আলো জানলার একদম সামনে। কে ধাক্কা দিচ্ছে এতো রাতে? বীরেনবাবু বলেছিলেন এখানে কেউ থাকে না! কোনও বড় বিপদ হল নাকি! কেউ কি সেটাই জানাতে এসেছে?

বাইরে থেকে অনেক লোকের গলা ভেসে আসছে। কিন্তু তাদের কথা বোঝা যাচ্ছে না। কিরকম যেন অস্পষ্ট উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সাহস জড়ো করে জানলার কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

জানলার বাইরে জায়গায় জায়গায় ঘন কুয়াশা। জমাট বাঁধা কুয়াশা বাগানে যেন চাদর গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কুয়াশা আর মশালের আগুনের বাইরে অন্য কোনো কিছুরই যেন কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একই সঙ্গে বাইরের কাঠের দরজায় আর ঠিক সামনের জানলায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছে। সে ধাক্কায় বারবার বাইরের দরজা-জানলা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে যে কোন সময় জানলা ভেঙে ঢুকে আসবে।

নাহ, বীরেনবাবু এর মধ্যে কিভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন কে জানে! এতো গভীর ঘুম।

ওঁকে না ডেকে আর কোনও উপায় নেই। যদি সত্যি কোন জরুরি কারণে এত লোক বাইরে জড়ো হয়, সেটা ওঁর জানা উচিত।

—বীরেন বাবু, বীরেন বাবু, বী-ডাকতে গিয়ে গলার থেকে আর কোনও আওয়াজ বেরোল না।

আগে খেয়াল করিনি। বীরেনবাবুর এ কি হয়েছে? ঠোঁটের পাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। নাক আর কানের থেকেও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মুখের রং যেন বেশ কালো হয়ে গেছে। নিষ্প্রাণ চোখদুটো মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। গায়ে হাত দিলাম। গাতো বেশ গরম। কি করে এই সামান্য সময়ের মধ্যে এরকম হল? কি বীভৎস লাগছে মুখটা!

গায়ে হাত দিতেই শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। পালস দেখলাম। নেই। মারা গেছেন? কীভাবে?

ডাক্তার ডাকব কি? আমার কিছু পরিচিত ডাক্তার আছে। অন্তত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ফোনে জানাতে পারবে, এরকম পরিস্থিতিতে কি করা যায়!

ছুটে ড্রয়িংরুমে গিয়ে ফোন-এর ভারী রিসিভারটা তুললাম। কোনও রিং টোন নেই। ডেড ফোন। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছাড়লাম।

বাইরে দরজার ধাক্কা যেন বেড়ে গেছে। দরজা রীতিমতো কাঁপছে। একই সঙ্গে সে কম্পন যেন আমার মধ্যেও হচ্ছে। যেন যে কোনও মুহূর্তে দরজা ভেঙ্গে ওরা ভেতরে ঢুকে আসবে। কিন্তু কারা এরা? ড্রয়িংরুমের জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। নাহ, কারুর শরীর দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। শুধু মশালের আগুন দেখা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

কি বলছে শোনার চেষ্টা করে কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সবাই যেন একই কথা সুর দিয়ে বলছে।

যেন বলছে 'উঁই অয়ান্টেথ ইয়ন্ড বেলডামস, রিসিভেথ হার আউট'।

মনের মধ্যে অজানা কে যেন আমাকে অনুবাদ করে বলে দিল তার অর্থ। 'আমরা ওই ডাইনীকে চাই। বার করে দাও।'

কিন্তু কারা এরা? কেন মধ্যযুগীয় ইংরাজিতে কথা বলছে? কে ডাইনী? সেরকম কেউ কি বাড়ির মধ্যেই আছে?

আবার টীরুমে ফিরে আলাম। এ কী হল? আমার চোখের সামনে বীরেনবাবু মারা গেলেন! আমি কিছুই টের পেলাম না! দরজা খুলে দেব! কিন্তু এরা কারা? এরকম বিচ্ছিন্ন জঙ্গলের মধ্যে। তাও কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আবার ওর গায়ে হাত দিলাম। গায়ের উষ্ণতা কমছে যেরকম মৃত্যুর পর হয়। চোখ এখনও খোলা। কিন্তু সে চোখে দৃষ্টি নেই। মাথা কাত হয়ে একদিকে হেলে গেল। যা দেখছি তা যে স্বপ্ন নয়, তার প্রমাণ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে পেলাম। শুধু মুখ-চোখ থেকে রক্ত বেরিয়েছে তা নয়, গায়ের চামড়া ফেটেও রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়েছে। সে রক্ত আমার হাতেও এসে লেগেছে।

শেষ পর্যন্ত আমার জন্যেই কি বীরেনবাবু মারা গেলেন? আমি ওই বোতলের তরল ফেলে দিয়েছিলাম বলেই কী ওঁর এই অবস্থা হল? তার মানে এখন এ বাড়িতে কী সেই ডাইনী এসে গেছে? সে কি এখন এ বাড়িতেই আছে আমার আশেপাশে কোথাও? সে ডাইনীর খোঁজেই এ বাড়ী ঘিরে ধরেছে সে সময়ের অশরীরী গ্রামবাসীরা? জানি এ ধরণের চিন্তাভাবনা কতটা অবান্তর। কিন্তু সামনে কম্পমান মোমবাতির আলোর শিখা যেন তাতে সায় দিচ্ছে। এসব প্রশ্ন এক অজানা ভয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হল যেন মাথা আর কাজ করছে না।

পায়ের নীচের মেঝের পাথর যেন বরফের মতো ঠান্ডা মনে হল। মনে হল পা দুটো যেন কেউ পাথরের মেঝেতে গেঁথে দিয়েছে। ফের সোফায় বসে পড়লাম।

৮

আলমারির মধ্যে কে?

এতক্ষণ মনের মধ্যেযেটুকু জোর ছিল, মনে হল আর নেই। হাত-পা অসার হয়ে গেছে। যেন কেউ খুব কাছেই কেউ আছে। শুধু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে আমাকে দেখছে। খুব খুঁটিয়ে দেখছে। যেন এ বাতাসে সে নিশ্বাস নিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশেই।

মনে হল ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাই। কিন্তু বাইরে ওরাই বা কারা? ওদেরও কী বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই? ওরাও কি সব অশরীরী?

আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। ভূতে সামান্যতম বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমার আশেপাশে যা ঘটছে, তাকে তো অন্য কোনওভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এরকম অচেনা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জায়গায় বসে যেখানে আমার একমাত্র জীবিত সঙ্গীও আর বেঁচে নেই।

আমার মৃত্যুও কি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা? মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

চারদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। নাহ, ঘরে কেউ নেই। অন্তত যেটুকু জায়গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নেই। অবশ্য ঘরের প্রত্যেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে না। জানলার বাইরে মশালের আলো থাকলেও ঘরের ভেতরে মোমবাতির আলোর বৃত্তের বাইরে শুধুই অন্ধকার। লোকগুলোর মতো বাইরের মশালের আলোও যেন ঘরের ভেতরে আসতে পারছে না।

এখানেই কি এমা আছে? আমার পাশে কোথাও? সে কী আমার সাহায্য চায়? নাকি যে কোন সময়ে সে আমার সামনে এসে তার উপরে হওয়া অন্যায়ের বদলা নেবে? মনকে সান্ত্বনা দিলাম সে তো এক সাধারণ অসহায় মেয়ে। সে তো কোনও দোষ করে নি! হয়তো সে আজও এ বাড়ির এঘর থেকে ওঘর ছুটোছুটি করে খেলতে চায়। আজও কোনও বন্ধুর অপেক্ষায় থাকে।

নিজের অসহায়তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত বিষণ্নতা যেন আমাকে গ্রাস করছিল। যেন মনে হচ্ছিল এ ঘরের বাতাসে কারো কান্না মিশে আছে। কে যেন আঙুল দিয়ে কাচের জানলায় আমাকে মনে করানোর জন্য তার নাম লিখছে। কে যেন আমাকে তার কত না বলা কথা শোনাতে চায়। এ বাড়ির সব ছবিতে যেন তার হাতের ছাপ। তার বহু শতকের অপূর্ণ ইচ্ছে আমাকে যেন গভীরভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন অব্যক্ত ইশারায় বারণ করছে বাইরের দরজা খুলতে।

মনে হল আমিও যেন সেই সময়ের, সেই ঘটনারই অংশ। যেন দিন-রাতের বেড়া টপকে সময়ও এখানে এগোতে পারছে না। ঘুরে ফিরে কোন এক বিশেষ দিনের ঘেরাটোপে আটকে পড়ে আছে। সময়ও যেন সে অপরাধকে পিছনে ফেলে এগোতে পারছে না।

মনে হচ্ছে আমার খুব বড় কোনও আপনজন যেন এখানে আমার জন্যে বহু বছর ধরে আমার অপেক্ষায় দিন গুনছে। আমি আজ হঠাৎ করে এখানে হাজির হই নি। এ যেন ভবিতব্যই ছিল। আজ সে সময় এসে গেছে। তাকে উদ্ধার করতেই আমি এসেছি। ওকে উদ্ধার করতে হবে এই বাইরের শকুনদের হাত থেকে। শুধু আমিই সেটা পারি।

এই অনুভূতি যেন খানিকক্ষণের জন্য আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। নিজেকে খানিকবাদে ফিরে পাওয়ার পরে খেয়াল করলাম গলা শুকিয়ে কাঠ।

খাবার জল টেবিলের উপরে একটা জাগে রাখা ছিল। উঠে গিয়ে জল খেতে গেলাম। আবার তখনই সেই মাছির লার্ভা চোখে পড়ল। সাদা সাদা অজস্র লার্ভা মেঝের উপর দিয়ে যেন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। খানিক আগেই পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম। আবার এরা এসে গেছে!

কোথা থেকে আসছে? খেয়াল করতে দেখলাম কোণের আলমারির দিক থেকে যেন ওদের যাত্রাপথ শুরু হয়েছে। আলমারির মধ্যেও কি ওরা আছে? ওদিকে গিয়ে কোনের আলমারির কাঠের দরজা টানতে খুলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরে হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘন অন্ধকার আর পচা একটা গন্ধ।

আর তারপরেই যেন একটা হাই ভোল্টেজ শক খেলাম। মাথা যেটুকু কাজ করছিল যেন সেই মুহূর্তে থেমে গেলো। সামনের জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন কারো চেহারার ছদ্মবেশ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে অন্ধকার আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে একটা মেয়ের চেহারা নিয়ে ধরা দিল।

আমার সামনে ঠিক একফুট দূরে আলমারির মধ্যে সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার একজন ইংরেজ মেয়ে। মুখ দেখে মনে হয় বছর পনেরো-ষোলো হবে। মুখে অসহায়তার ছাপ। মুখের মধ্যে অদ্ভুত এক ইনোসেন্স। খুব ভয় পেয়েছে। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে এক অজানা বিষণ্ণতা। চুলের দু-দিকে বিনুনি। গায়ে একটা পা অব্দি সাদা গাউন। জামার হাতা কনুই অব্দি। খুব মিষ্টি দেখতে।

নীলচোখ দুটো যেন পাথরের। আমার দিকে নিবদ্ধ। আমাকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। মুখে আস্তে আস্তে হাসি ফুটে এলো। আমারও মনে হল যেন ওকে আমি খুব ভালো করে চিনি। কোথায় যেন ওকে বহুদিন দেখেছি।

—প্রি-প্রিথি সাভেথ মি। দো-দোস জেন্টস আরট গোইং টু কিলেথ মি।

অর্থাৎ 'আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

কিন্তু আমি ওর কথা বুঝতে পারছি কী করে?

এই কি এমা? একেই কী খুঁজছে ওরা? বাইরের লোকজন।

আমি কিছু বোঝার আগেও আমার হাত ধরার জন্য ওর ডান হাত বাড়িয়ে দিল। আমার সাহায্য চায়। আমি সে হাত না ধরে থাকতে পারলাম না।

আর সে হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে হল এ বহুজন্মের সম্পর্ক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর থেকেও ও যেন আমার কাছে বেশি মূল্যবান। এই মুহূর্তের জন্য যেন আমি কত জন্ম অপেক্ষা করে আছি। মনে হল এ হাত ধরে আমি যেন সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে যেতে পারি। এক মহাবিশ্ব থেকে আরেক মহাবিশ্ব পাড়ি দিতে পারি।

ওকে টেনে আলমারির মধ্যে থেকে বার করে নিলাম। ও প্রায় আমার গায়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেন বহু শতক পরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছে।

মুহূর্তে মনে হল এ বাড়ীর সব কিছু যেন আমি জানি। এর ইতিহাসের মধ্যে আমিও ছিলাম। এর সঙ্গে আমার যেন বহু জন্মের পরিচয়। ঠিক এমার মতো।

আমি জানি কি করতে হবে। ওর হাত ধরে ছুটে বাড়ির পিছন দিকের কনসারভেটরির মধ্যে দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এলাম। চ্যাপেলের দিকে ছুটে গেলাম। চ্যাপেলের মধ্যে একটা আলমারির পিছনে একটা গুপ্তদরজা আছে। সেটা দিয়ে বেরোলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা গুপ্ত পথ আছে। সেই পথ মাটির নীচ দিয়ে গেছে। আমরা সেই পথ দিয়ে ছুটে চললাম। একটা পাহাড়ী গুহার মধ্যে দিয়ে খানিকটা গিয়ে সেই পথ আরেকটা পথে গিয়ে মিশল। সেখান দিয়ে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। খানিক বাদে একটা সরু রাস্তা পেলাম। গ্রামের রাস্তা।

আমি ওকে বাঁচাবোই। তার জন্যে যদি আমার প্রাণের মূল্য দিতে হয় তাও ঠিক আছে। ওকে ধরতে পারলেই সবাই ওকে মেরে ফেলবে। সে আমি জানি। সরু রাস্তা দিয়ে দুপাশের ছোট ছোট মাটির বাড়ির পাশ দিয়ে ছুট লাগালাম। এসব বাড়ী এ জঙ্গলের মধ্যে এলো কোথা থেকে? আসার সময় দেখি নি তো?

বেশ কিছু জায়গায় রাস্তার দুধারে মৃতদেহ পড়ে আছে। রাস্তার দুধার দিয়ে অনেক আবর্জনা। চারদিকে বিশ্রী পচা গন্ধ। কিছু কুকুরের ডাক শুনলাম। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছাড়া সবাই যেন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে।

কিন্তু এ নীরবতা যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেলো। কিছু পায়ের শব্দ। মনে হল উল্টোদিক থেকে কিছু লোক যেন আসছে। ও দু-হাত দিয়ে আমার হাত শক্ত করে ধরল। আমরা রাস্তা ছেড়ে পাশের জঙ্গলের

কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম।

হঠাৎ কিছু দূর থেকে ফের যেন কোলাহল শুনতে পেলাম। আমাদের পিছু নিয়েছে একদল লোক। আরও জোরে ছোটার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না। এমা আর পারছে না। বারবার পিছিয়ে পড়ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোটার চেষ্টা করছে। ওর গাউন জঙ্গলের চোরাকাটায় আটকে আটকে যাচ্ছে। মশালের আলোর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমে আসছে।

বলে উঠলাম 'রানেথ ফেস্টিনেটর'। জোরে ছোট।

ও আর পারছে না। দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখে জল।

ওকে কোলে নিয়ে নিলাম। মনে হল যেন একটা ঠান্ডা মৃত শরীর তুলে নিলাম। বেশ ভারী। ছুটতে পারলাম না বেশিক্ষণ। হঠাৎ উলটো দিক থেকে যেন কিছু লোক আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালো।ও ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধারেছে। আমার আর কিছুই করার নেই। মশালের আড়ালে থাকা সব মুখগুলো এবারে দেখতে পাচ্ছি। সবার মুখে রক্ত, কারো কারো মুখ পুড়ে গেলে যেমন কালো হয়ে যায়, সেরকম কালো। প্লেগে মারা গেলে যেরকম হয়। চোখ বলে কিছু নেই। সেখানে যেন গভীর কালোগর্ত। বুলেটের গর্তের মতো।

আমাদের চারদিক থেকে ওরা ঘিরে ধরছে। এমা যেন আমার গায়ের মধ্যে মিশে গেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র ছায়া আমাদের কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। কী হতে চলেছে তা আমি খুব ভালো করে জানি। এ সময়, এ মুহূর্ত, দূরে মেঘের আড়ালে লজ্জায় মুখ লুকনো নীরব চাঁদের আলো আমি যেন আগেও দেখেছি। এমা-কে আমার আরও কাছে টেনে নিলাম।

হঠাৎ মাথায় যেন কি লাগল? লাঠির বাড়ি? অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।



৯

ফিরে পাওয়া

একমাস পরের কথা। দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। প্লেগ, একই সঙ্গে নার্ভাস ব্রেকডাউন। মাথাতেও চোট পেয়েছিলাম। বারমিংহ্যাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে যখন ফিরলাম, তখনও যেন মনে হচ্ছিল সে রাতেই পড়ে আছি। সে রাত যেন আর শেষ হবে না।

শুনেছিলাম জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অচেতন অবস্থায় একদিন পরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। গায়ে তখন আমার খুব জ্বর। বীরেনবাবু মারা গিয়েছিলেন। প্লেগে। ওঁর কাজের লোকেরা পরের দিন আমাকে খুঁজে পায়।

কী করে যে আমাদের দুজনের অত কম সময়ের মধ্যে প্লেগ হয়েছিল, সে এক রহস্য। বিশেষ করে আজকের দিনে। বাড়ির কাজের লোকেদের তো হয় নি! কীভাবে একরাতের মধ্যে বীরেনবাবু প্লেগে মারা গেলেন, তারও কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আমাকে পুলিস অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। আমি ঠিক যা হয়েছিল, তা বলেছি। কিন্তু আমি যা বলেছি, মনে হয় না কেউ কিছু বিশ্বাস করেছে। তবে আমি যে ওঁর মৃত্যুর কারণ নই, সেটা অন্তত বুঝেছিল।

বলতে নেই ভদ্রলোক আমার এক খুব বড় উপকার করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাকে উপহার দিয়েছেন এমন এক অনির্বচনীয় ঘটনা, যা শুধু যে আমাকে গল্প লিখতে উদ্বুদ্ধ করবে, তাই না! সে ঘটনা থেকে পাওয়া কিছু অভিজ্ঞান আমার সঙ্গে থেকে যাবে সারা জীবন। হয়তো আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে সে কারণও ছিল।

আগামীকাল আমার লন্ডন অফিসে জয়েন করব। আমি আগে এতদিন কখনো ছুটি নিই নি। এতোদিন ধরে অফিস থেকে দূরে আছি, ওদিকে কী হচ্ছে কে জানে!

আমিও এক' দিনে অনেক পালটে গেছি। ছোটখাটো ভালোলাগার, চাহিদার বাইরে জীবনকে অন্যভাবে দেখতে শিখেছি। বুঝেছি শুধু ভালোবাসার জন্য সময়ের সব হিসেবের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করা যায়।

আমার ফ্ল্যাটে বসে চুপচাপ এসব ভাবছিলাম। সামনে দূরে একটা বড় ম্যাপল গাছ। তার পাতায় ভারী সুন্দর লাল—গোলাপি রঙের ছোঁয়া। ঠিক এমার গোলাপি ঠোঁটের মতো। গাছের পাতার মধ্যে যেন ওই লুকিয়ে আছে। কিন্তু সেই রূপসী গাছের পিছনে সিগন্যালহীন টিভির মতো ঘোলাটে আকাশ।

হঠাৎ ঘরের কোন থেকে আমার সেই পরিচিত ফিসফিসানি কণ্ঠস্বরটা ভেসে এলো। সামান্য তোতলামোর সঙ্গে সে নারীকন্ঠ বলে উঠল—হোও-হোওয়ার আরট দি লি-লিয়েফ?

যার অর্থ—কোথায় তুমি প্রিয়?

বলে উঠলাম—আই আম হার। আমি এখানে।

ও এমার কথা তোমাদের বলা হয় নি। ও এখন আমার সঙ্গেই থাকে। আমার বাড়িতে। ও এখানে থাকলেও ওর জগতেই থাকে, সামনে আসে না। সেখানে কাউকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। আকাশের মতো। চোখের সামনে থাকলেও শুধু শব্দ আর অনুভূতি দিয়ে ওকে ছোঁয়া যায়।

আমি ওকে সত্যি খুব ভালোবাসি। মনে হয় আমরা আবার নিজেদের ফিরে পেয়েছি।

আমরা এখন অনেক সময় নিজেদের মধ্যে গল্প করে সময় কাটাই। মুখোমুখি বসে। যেরকম আগে করতাম। কীভাবে সময় কেটে যায় বুঝি না। ঘণ্টা, মিনিটের কাঁটা অসহায় দর্শকের মতো আমাদের সামনে বসে থাকে। সাতশ বছরের অনেক গল্প জমে আছে। সেটা শেষ করতে এক জন্ম যথেষ্ট নয়।

